ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana™
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬১ বর্ষ ২ সংখ্যা ।। ১৫ ভাদ্র, ১৪১৫ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১০) ১ সেপ্টেম্বর, ২০০৮ ।। Website : www.eswastika.com

সততার প্রতীক মমতার বন্ধু 'এম-পি কেনা' অমর সিং?

সিঙ্গুরের ধর্না মঞ্চে অমর সিং-এর সঙ্গে মমতা ব্যানার্জী।

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। লালকৃষ্ণ আদবানীকে ছেড়ে অমর সিং-এর হাত ধরে জাতীয় রাজনীতিতে নতুন করে নামতে চাইছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লালকৃষ্ণ আদবানীর চেয়েও তাঁর অমর সিংকে আরও বেশি বিশ্বস্ত ও কুশলী রাজনেতা মনে হয়েছে। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে সিপিএমের হয়ে দিল্লীতে দালালি করাই যে নেতার ধর্ম ছিল, তাঁকেই তিনি সিঙ্গুরে কৃষক আন্দোলনে সামিল করেছেন। অথচ তার আগে ভাবেননি, উত্তরপ্রদেশের বারাবাঁকিতে এই অমর সিং অমিতাভ বচ্চনকে চাষি সাজিয়ে জমি দিয়েছিলেন। অনিল আম্বনিকে হাজার হাজার একর জমি বিলি করে দিয়েছিলেন চাষিদের ক্ষতিপূরণ না দিয়েই। পরে মায়াবতী সরকারে এসে অবশ্য অমর সিংদের চোখের জলে নাকের জলে করে ছেড়েছেন। এহেন অমর সিং এখন মমতার প্রিয় বন্ধু। এন ডি এ জমানায় তহেলকা কেলেঙ্কারির প্রতিবাদে মমতা রেলমন্ত্রীত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন। তহেলকা টেপে দেখানো হয়েছিল, বিজেপির এক শীর্ষনেতা নাকি ভুয়ো অস্ত্র সরবরাহকারী এক এজেন্টের কাছ থেকে ঘুষ নিচ্ছেন। সেই নেতাকে বিজেপি দল থেকে সাসপেণ্ড করে দেয়। গত আট বছরেও তিনি আর দলে ফিরতে পারেননি। দল তাঁকে প্রশ্রয় দেয়নি। এবারের লোকসভার আস্থা ভোটে এরকমই এক টেপ প্রকাশ পেয়েছে। যাতে দেখা হচ্ছে, অমর সিং-এর নেতৃত্বে সমাজবাদী পার্টি এবং কংগ্রেস এম পি কিনে আস্থাভোটে জিতছেন। সেই টেপটি এখন লোকসভার স্পিকারের তৈরি করা কমিটির তদন্তাধীন। অমর

(এরপর ২ পাতায়)

কে সত্যি কথা বলছেন?
রতন টাটা না বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

গূঢ়পুরুষ ।। টাটার মোটরগাড়ির কারখানাকে কেন্দ্র করে সিঙ্গুর এখন রাজ্য রাজনীতির রণক্ষেত্র। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে রতন টাটাকে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে বলতে হচ্ছে যে আমরা পশ্চিমবঙ্গে অবাঞ্ছিত হলে অন্য রাজ্যে চলে যাব। রতন টাটার হুমকিতে কাতর হয়ে কলকাতার সংবাদমাধ্যম এক সুরে মড়াকান্না জুড়ে দিয়েছে। সেই কান্না শুনলে মনে হবে সংবাদমাধ্যম যেন আসন্ন পিতৃবিয়োগে দিশাহারা। বলা হচ্ছে যে টাটাদের মোটরগাড়ি সিঙ্গুরের কারখানা থেকে না বেরলে পশ্চিমবঙ্গের শুধু অর্থনীতিই নয়, বাঙালির মান মর্যাদা সম্মান সবই ধূলোয় মিশিয়ে যাবে। দেশের কোনও শিল্পগোষ্ঠী পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ করতে ভরসা পাবে না। সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেলের লাগাতার প্রচারে মনে হতে পারে যে দেশের ও বিদেশের পোড় খাওয়া শিল্পপতিরা জানেন না সিঙ্গুরে টাটাদের মোটর কারখানার বিরোধিতা কেন করা হচ্ছে। শিল্পপতিরা জানেন না কারখানার জমি কীভাবে সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে বন্দুকের নল বুকে ঠেকিয়ে কৃষকদের কাছ থেকে বুদ্ধবাবুরা কেড়ে নিয়েছিলেন। তাঁরা সোজা সরল পথে চললে সিঙ্গুর আজ রণক্ষেত্র হতো না। মিত্তল শিল্পগোষ্ঠি মেদিনীপুরের শালবনিতে বৃহৎ একটি ইস্পাত কারখানা গড়ছে। কই, শালবনি রণক্ষেত্র হয়নি। কারণ, মিত্তলরা সোজা সরল পথে সরাসরি জমির মালিকদের কাছ থেকে টাকা খরচ করে কারখানার জমি কিনছেন। আলিমুদ্দিনের দ্বারস্থ হননি। সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনীকে জমি দখল করতে পাঠাননি। যেমনটা, নন্দীগ্রামে জমি দখল করতে পাঠানো হয়েছিল। প্রশ্নটা ঠিক এখানেই। বুদ্ধবাবুরা কেন জবাব দেবেন না যে সিঙ্গুরে টাটারা কেন সরাসরি জমি কেনেননি? সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ আছে যে শিল্প গড়তে শিল্পপতিদেরই সরাসরি মালিকদের কাছ থেকে জমি কিনতে

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

হবে। অথচ সিঙ্গুরে রাজ্য সরকার আগ্ বাড়িয়ে জনগণের টাকায় জমি অধিগ্রহণ করে প্রায় বিনামূল্যে টাটাদের জমি পাইয়ে দিয়েছে। কেন? কার স্বার্থরক্ষায়? সি পি এম নেতৃত্ব দাবি করেছিলেন যে পরমাণু চুক্তির শর্তাবলী কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাতে হবে। এই দাবি না মানায় বামপন্থীরা ইউ পি এ সরকারের উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছে। তবে টাটাদের সঙ্গে যে চুক্তি বুদ্ধবাবুদের সরকার করেছে তা কেন আজও গোপন রাখা হয়েছে? সেই চুক্তিতে কী কী শর্ত আছে তা জানার অধিকার পশ্চিমবঙ্গের মানুষের নিশ্চয় আছে। রতন টাটা কেন বলছেন না যে তাঁরা সরাসরি জমি না কিনে বাঁকা পথে জমি দখল করেছেন কোন কোন দালাল মাতব্বরদের পরামর্শে?

সিঙ্গুরের জমি অধিগ্রহণ বিতর্কের শুরুতেই কলকাতা হাইকোর্টে মামলা হয়।

রতন টাটা

পরে সেই মামলা চূড়ান্ত ফয়সালার জন্য সুপ্রিম কোর্টে যায়। সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিয়ে টাটারা তখন জানিয়েছিল যে সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনওভাবেই তারা যুক্ত ছিল না। গাড়ি কারখানার জন্য সরকার কোথায় জায়গা দেবে তাও পছন্দ করে দেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র যাতায়াতের সুবিধার জন্য কলকাতার কাছে জমি দেওয়ার কথা বলা

(এরপর ২ পাতায়)

সিমি প্রধানের স্বীকারোক্তি
কাশ্মীরী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে যুক্ত সিমিও

সফদর নাগৌরি

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। সিমির সঙ্গে কাশ্মীরী বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সন্ত্রাসবাদীদের গভীর যোগাযোগ রয়েছে। ইন্দোর থেকে গত২৭ মার্চ ধৃত সিমি বা স্টুডেন্ট ইসলামিক মুভমেন্ট অফ্ ইণ্ডিয়ার সর্বভারতীয় প্রধান সফদর হুসেন নাগৌরি নিজেই মধ্যপ্রদেশ পুলিশকে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে একথা জানিয়েছে। মধ্যপ্রদেশ পুলিশ সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। ২০০২ সালে কাশ্মীরী বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদের সঙ্গে দিল্লীস্থিত পাকিস্তান দূতাবাসে পাক রাষ্ট্রদূত রিয়াজ খোকরের এক বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে নাগৌরিও যোগ দিয়েছিল। নাগৌরি আরও জানিয়েছে, তার সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক হয়েছে কাশ্মীরী বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা সৈয়দ আলি শাহ্ গিলানি, মৌলভি আব্বাস আনসারি, মীর ওয়াইজ ওমর ফারুক এবং ইয়াসিন মালিকেরও। এই ঘনিষ্ঠতা বজায় রয়েছে বছরের পর বছর — ১৯৯৬-৯৭ থেকেই। দিল্লীর পাক দূতাবাসের ইফতার পার্টিতে নাগৌরি ও তার দলের (সিমি) সইফ নাচান, আবদুল ওরফে তাকিরও গিয়েছিল। ইফতার পার্টির আয়োজক ছিলেন পাক রাষ্ট্রদূত রিয়াজ খোকর। এবার অনুমান করা যেতে পারে নতুন দিল্লীর পাক দূতাবাসে এই সব ভারত বিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতারা কোন্ আলোচনা সারেন আর বৈঠক করেন!

মধ্যপ্রদেশ পুলিশের ধৃত সিমি নেতাদের জিজ্ঞাসাবাদের 'টপ্ সিক্রেট' অংশ থেকে জানা গেছে যে, কাশ্মীরী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সবরকম মদত ও উস্কানিতে সিমি ক্রমে কট্টরপন্থী ইসলামি জঙ্গি সংগঠনে পরিণত হয়। সিমির কয়েকজন নেতা — সাহিদ বদর ফালাহি, মিসবাউল ইসলাম প্রমুখেরা

(এরপর ২ পাতায়)

স্বামী লক্ষ্মণানন্দের হত্যা
পিছনে কি খৃস্টানদের ষড়যন্ত্র?

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। ওড়িশার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসী ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অন্যতম মার্গদর্শক স্বামী লক্ষ্মণানন্দ সরস্বতী ও তাঁর ৪ জন ভক্ত শিষ্য দুষ্কৃতীদের আকস্মিক আক্রমণে নিহত হয়েছেন। গত ২৩ আগস্ট রাত সাড়ে সাতটা নাগাদ কন্ধমাল জেলার জলসপটা কন্যাশ্রমে দুষ্কৃতীরা ঢুকে পড়ে। দুষ্কৃতীদের এই দলটিতে ৩০-৩৫ জন ছিল। সেই সময় লক্ষ্মণানন্দ শৌচাগারে ছিলেন। দরজা ভেঙে দুষ্কৃতীরা তার উপর গুলি চালায়। তাঁকে বাঁচাতে ভক্ত শিষ্য অরূপানন্দ, চিন্ময়ানন্দ ও মাতা ভক্তিময়ী ছুটে এলে দুষ্কৃতীদের গুলিতে প্রাণ হারান তাঁরাও। আশ্রমের জনাপাঁচেক আবাসিকও আহত হন। প্রথমে দুষ্কৃতীরা আশ্রমের কাছে পুলিশ পিকেটিং-কে ঘিরে ফেলে। আক্রমণকারী দলের কাছে তারা এঁটে উঠতে পারেনি। দুষ্কৃতীদের কাছে একে ৪৭ এবং রিভলবার ছিল। আশ্রম চত্বরে বেশ কয়েকটি বোমাও মারে।

এই হত্যাকাণ্ডের পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তীব্র প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেছে ভি এইচ পি সহ অন্যান্য হিন্দুত্ববাদী সংগঠন। রাস্তা অবরোধ, রেল রোকো তো ছিলই, গত ২৫ আগস্ট ওড়িশায় ১২ ঘণ্টা সর্বাত্মক বনধ্-ও পালিত হয়। ওড়িশা সরকারের পক্ষ থেকে এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে বিচারবিভাগীয় তদন্তের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। মৃতদের পরিবার পিছু দু'লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে সরকার।

স্বামী লক্ষ্মণানন্দ

লক্ষ্মণানন্দ সরস্বতীর মূল আশ্রম কন্ধমাল জেলার ফুলবানীর চকাপাদ-এ। ভুবনেশ্বর থেকে ১৫০ কিলোমিটার দূরে গভীর জঙ্গল এলাকায় জনজাতিদের সেবার জন্য এই আশ্রম তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জলসপটায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত কন্যা আশ্রমে তিনি জন্মাষ্টমী উপলক্ষে পুজো ও উৎসবে যোগ দিতে এসেছিলেন। ৮০ বছর বয়স্ক লক্ষ্মণানন্দ সরস্বতী ওই এলাকায় গত চার দশক ধরে বনবাসী জনজাতিদের জন্য কাজ করে চলেছেন। সেবা ও প্রলোভনের আড়ালে স্থানীয় দরিদ্র জনজাতিদের খৃস্টান করার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি পরাবর্তন আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তাঁর এই কাজের জন্য কলকাতা বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয় তাঁকে বিবেকানন্দ সেবা সম্মান-এ ভূষিত করে। অনেকদিন ধরেই তাঁকে হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। গত সপ্তাহেও তাঁর

(এরপর ২ পাতায়)

কলকাতায় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের উদ্যোগে জন্মাষ্টমী

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। দেশ, ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি রক্ষার জন্য সকল হিন্দুকে একত্রিত ও সংগঠিত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রদর্শিত ধর্মযুদ্ধে সামিল হতে হবে। কেননা এখন যুদ্ধ আর সীমান্তে সীমাবদ্ধ নেই। সারা দেশই সন্ত্রাসবাদীদের সহজ বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এই দেশ রাম, কৃষ্ণ, শিব-এর দেশ। শুধুমাত্র ভক্তি নয়, শক্তি চাই। যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ, ডাক্তার হেডগেওয়ার — এঁরা সকলেই দেশ ধর্ম সমাজ রক্ষায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে পথ প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁদের প্রদর্শিত পথেই আমাদের দ্রুত এগিয়ে যেতে হবে।

শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ আয়োজিত দু'দিনব্যাপী হিন্দু ধর্ম শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ ২৪ আগস্ট সন্ধ্যায় বালিগঞ্জে সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয়ের সামনে এক জনসভায় প্রধান বক্তার ভাষণে কথাগুলি বলেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্রের ক্ষেত্র প্রচারক সুনীলপদ গোস্বামী। শ্রীগোস্বামী আরও বলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মেছিলেন কারাগারে ঝড়বৃষ্টির রাত্রে, এক দুর্দিনে। কিন্তু তিনি ধর্মরক্ষার্থে, সমাজকে সংগঠিত করে রাষ্ট্রবিরোধী, ধর্মবিরোধী শক্তিকে বিনাশ করেছেন। তিনি একাই সব কিছু করতে পারতেন। তা না করে ধর্মশক্তিকে একত্রিত করে লড়াই-এ উদ্বুদ্ধ করেছেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে অর্জুনকে ক্লীবতা কাপুরুষতা পরিত্যাগ করে ধর্মরক্ষার জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত করেছেন। বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সেই একই লড়াইয়ে সবাইকে প্রবৃত্ত হতে হবে। শ্রীকৃষ্ণের জীবনের বিভিন্ন বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করে সবশেষে তিনি সকলকে ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতি রক্ষার জন্য আহ্বান জানান।

সভার অন্য বক্তা বরিষ্ঠ বিজেপি নেতা ও সুলেখক তথাগত রায় বলেন, আমরা সবাই হিন্দু। বাংলাদেশে হিন্দুরা থাকতে পারেনি। আজ ঢাকা, কুমিল্লা, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, বরিশাল আমাদের কাছে বিদেশ। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়। শ্যামাপ্রসাদের কারণে আমরা হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গে ঠাঁই পেয়েছি। এটাও হাতছাড়া হতে বসেছে। এটা যেন সবাই মনে রাখি। অহিংসা দুর্বলের নীতি। শ্যামাপ্রসাদকেও হিন্দু স্বার্থরক্ষায় প্রেরিত করেছিলেন আচার্য প্রণবানন্দজী মহারাজ।

(এরপর ১৬ পাতায়)

লক্ষ্মণানন্দ খুন ঃ খৃষ্টানদের ষড়যন্ত্র?

(১ পাতার পর)

জীবন বিপন্ন হতে পারে এই মর্মে তিনি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। এরপরও স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। এই ঘটনার জেরে এখন জেলার পুলিশ সুপার নিখিল কানোড়িয়াকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ২৫ ডিসেম্বর, ২০০৭, খৃস্টান সম্প্রদায়ের একটি দল তাঁকে এবং তাঁর দেহরক্ষীকে আক্রমণ করে। এতে তিনি এবং দেহরক্ষী গুরুতর আহত হন। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় সেসময় ফুলবানীসহ অন্যান্য স্থানে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

স্বামী লক্ষ্মণানন্দ জনজাতি অধ্যুষিত কন্ধমাল জেলায় এসেছিলেন সেই ১৯৬৫ সালে। তখন থেকেই খৃস্টান মিশনারীদের ধর্মান্তরকরণ সংক্রান্ত কাজকর্মের বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন চালিয়ে আসছিলেন। তাঁর এই আন্দোলনের ফলে ধর্মান্তরিত কয়েক হাজার জনজাতি আবার হিন্দুধর্মে ফিরে আসে।

পরবর্তীকালে তিনি চকাপাদ-এ একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। জলসাপটাতে স্থাপন করেন ছাত্রীনিবাস 'কন্যাশ্রম', যেখানে থেকে জনজাতি সমাজের মেয়েরা পড়াশোনা করতো। জনজাতি সমাজে শিক্ষার প্রসারে তিনি আজীবন কাজ করে গেছেন।

ওড়িশা সরকার এই হত্যার পিছনে মাওবাদীদের দিকে অঙ্গুল নির্দেশ করায় অনেকগুলি প্রশ্ন উঠেছে। প্রথম প্রশ্ন, মাওবাদীরা একজন ধর্মগুরুকে খুন করতে যাবে কেন? তাও আবার জন্মাষ্টমীর মতো একটা উৎসবের সময়ে? নবীন সরকার কি মাওবাদীদের দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে চাইছেন এবং এইভাবে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিয়ে সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়া ঠেকাতে চাইছেন? সরকার তা করতেই পারেন। কিন্তু স্বামী লক্ষ্মণানন্দ মাওবাদীদের কথা কখনও উল্লেখ করেননি। বরং তাঁর অভিযোগের তীর ছিল যারা তাঁর কাজের বিরোধিতা করে থাকে সেই খৃস্টান সমাজের একাংশের প্রতি। খৃস্টানদের একাংশ যে তাঁর পরাবর্তন আন্দোলনকে সহ্য করতে পারছিল না একথা তো সবার জানা। ইতিপূর্বে জীবনহানির আশঙ্কা করে তিনি বেশ কয়েকবার প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। কিছুদিন আগে ভুবনেশ্বরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি নিজেই এই আশংকার কথা ব্যক্ত করেছিলেন। পুলিশও এই আক্রমণকে পূর্বপরিকল্পিত বলেই মনে করছে। কেননা গত ডিসেম্বরে যে হামলা হয়েছিল, সে সময় কন্ধমাল জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রাম সিকারামা থেকে বহু অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছিল। একটি গ্রাম থেকে এত অস্ত্র (২০টি বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র) পাওয়ায় অনেক প্রশ্ন উঠেছিল। কেননা মাওবাদীরাও তা করে না। আর এতেই সন্দেহ আরও বাড়ে যে এলাকার অন্যান্য স্থানেও এরকম অস্ত্র মজুত আছে।

লোকসভার বিরোধীদলের নেতা এল কে আদবানী স্বামী লক্ষ্মণানন্দ-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে এই নৃশংস হত্যার তীব্র নিন্দা করেছেন এবং আশা প্রকাশ করেছেন যে রাজ্য সরকার দোষীদের খুঁজে বার করে কঠোর শাস্তি দেবেন।

কে সত্যি কথা বলছে?

(১ পাতার পর)

হয়েছিল। অথচ বুদ্ধবাবুরা পরে দাবি করেছেন যে রাজ্যের ছয়টি জায়গা দেখার পর টাটারা সিঙ্গুরকেই মোটরগাড়ির প্রকল্পের জন্য চিহ্নিত করেছিল। কে সত্যি কথা বলছেন? রতন টাটা না বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য? ঠিক এই ধোঁয়াশার কারণেই টাটাদের সঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের গোপন চুক্তিটি প্রকাশ্যে আনা প্রয়োজন। কারণ সুপ্রিম কোর্টে অসত্য হলফনামা দেওয়ার অপরাধে টাটারা অপরাধী হলে দেশের আইন শাস্তি পেতে হবে। অন্যদিকে, যদি দেখা যায় যে বুদ্ধবাবুরা অসত্য বিবৃতি দিয়েছেন তবে তার জন্য বুদ্ধবাবুদের জনগণের আদালতে শাস্তি পেতে হবে। সিঙ্গুর আর নন্দীগ্রামের মূল সমস্যাটি লুকিয়ে আছে এই মিথ্যাচার ও রাষ্ট্রশক্তির অপপ্রয়োগের মধ্যে বুদ্ধবাবু যখন বিধানসভায় বলেছিলেন, আমরা ২৩৫ আর ওরা ৩৫। কীভাবে সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণে ওরা বাধা দেয় দেখে নেব। তখন মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বাস করতেন স্রেফ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তাঁরা মিথ্যাচারকে সত্য বলে বাজারে চালিয়ে দিতে পারবেন। কিন্তু পারেননি। আর পারেননি বলেই নন্দীগ্রামে পিছু হঠতে হয়েছে। এবং অদূর ভবিষ্যতে সিঙ্গুরেও পিছু হঠতে হবে। বুদ্ধবাবু বলেছেন, নন্দীগ্রামে আমরা ভুল করেছিলাম। এবার সেই ভুলের খতিয়ানে সিঙ্গুরকেও যোগ করতে হবে।

রাজ্যের বিরোধী দলেরা একটি ব্যাপারে একমত যে অনিচ্ছুক চাষীদের কাছ থেকে সরকারি ক্ষমতাবলে জোর করে জমি অধিগ্রহণ করাটা অন্যায়। তাই অনিচ্ছুক মালিকদের জমি ফেরৎ দেওয়াই হবে উচিত কাজ। রাজ্য সরকার সিঙ্গুরের প্রায় এক হাজার একর কৃষিজমি অধিগ্রহণ করেছে। এর মধ্যে ৬০০ একর জমিতে টাটারা এখন কারখানা গড়ছে। কারখানার এই ৬০০ একর জমি নিয়ে তেমন কোনও বিতর্ক নেই। বিতর্ক আছে বাকি ৪০০ একর জমিকে কেন্দ্র করে। এই জমিতে ভবিষ্যতে মোটরগাড়ির প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ নির্মাণ করার পরিকল্পনা টাটাদের আছে। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় দাবি করেছেন যে এই ৪০০ একর জমির একটা বড় অংশই অনিচ্ছুক চাষীদের কাছ থেকে রাজ্য সরকার হুকুম দখল করেছে। তাই সেই জমি ফেরৎ দিতে হবে। পরিবর্তে কারখানার কাছেই অন্য জমি তিনি চিহ্নিত করেছেন। সেখানে যন্ত্রাংশ তৈরি অনুসারি শিল্প গড়ে উঠতে পারে।

কিন্তু রাজ্য সরকার এবং টাটারা এই প্রস্তাবে আপত্তি জানিয়ে নাকচ করে দিয়েছে। রাজ্য সরকার যুক্তি দেখিয়েছে যে অধিগ্রহণ করা জমি ফেরৎ দেওয়ার আইনগত অসুবিধা আছে। এই আইনগত অসুবিধাটা ঠিক কী সে কথা স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে না। টাটারা এখন বলছেন যে বিতর্কিত ৪০০ একর জমিতেও তাঁরা বহু টাকা লগ্নি করেছেন। তাই নাকি? মূল কারখানাই যেখানে বিশ হাত জলের তলায় সেখানে তাঁরা অনুসারি শিল্পের জন্য বরাদ্দ জমিতে ইতিমধ্যেই কোটি কোটি টাকা খরচ করে ফেলেছেন? বিশ্বাস হয় না। টাটারা খোলাখুলি ভাবে জানান বিতর্কিত ৪০০ একর জমিতে তাঁরা কত টাকা লগ্নি করে ফেলেছেন যে এখন সেই জমি ফেরৎ দিলে তাঁদের কত আর্থিক ক্ষতি হবে। রাজ্য সরকার বলছে যে আইনগত অসুবিধার জন্য ৪০০ একর জমির অনিচ্ছুক মালিকদের জমি ফেরৎ দেওয়া যাবে না। অথচ টাটারা বলছেন যে আর্থিক ক্ষতির জন্যই তাঁরা সিঙ্গুরের অন্যত্র যন্ত্রাংশ তৈরির প্রকল্পটি সরাতে পারছেন না। প্রশ্ন — কে সত্যি কথাটা বলছেন?

বুদ্ধবাবুরা এবং টাটারা উল্টোপাল্টা কথা বলে ধোঁয়াশা সৃষ্টি করেছেন। একটা মিথ্যা ঢাকতে দশটা মিথ্যা তাঁদের বলতে হচ্ছে। তাই বাংলার স্বার্থে তাঁদের উচিত টাটাদের সঙ্গে বুদ্ধবাবুদের গোপন ডিলটি প্রকাশ্যে নিয়ে আসা। ব্যবসার গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যাবে তাই চুক্তিটি বলা যাবে না এমন ছেঁদো কথায় চিঁড়ে ভিজবে না।

প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ মায়াবতী

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। মূলত দলিত ভোটের ওপর ভর করে ক্ষমতায় আসা বিএসপি নেত্রী মায়াবতীর রাজ্যে দলিতরা শুধু উপেক্ষিতই নয়, তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থারও ক্রমশ অবনতি ঘটছে। ২০০৭ সালে নির্বাচনী ইস্তোহারে দলিতদের উন্নতির জন্য যে প্রতিশ্রুতির দিয়েছিলেন তার ভগ্নাংশটুকুও পূরণ হয়নি। শিক্ষার দিক থেকে রাজ্যের তফশিলি জাতিগোষ্ঠী বহু পিছিয়ে। তাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বহিন মায়াবতী এখনও পর্যন্ত কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করেননি। এদিকে রাজ্যের শিক্ষার হাল নিয়ে রীতিমতো উদ্বেগে রয়েছে বিশেষজ্ঞমহল। রাজ্যের তফসিলি জাতিগোষ্ঠীর বেশিরভাগেরই গ্রামাঞ্চলে বাস। ফলে সমস্যাটা আরও গুরুতর। রাজ্যের ৫৪.৯৭ শতাংশ তফসিলি জাতিগোষ্ঠী এখনও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। যা জাতীয় স্তরের শিক্ষার গড় হার থেকে ৪১.৯ শতাংশ কম। ৩৮ শতাংশ তপসীলভুক্ত মানুষের মধ্যে শিক্ষাগত ধারণাই নেই। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার হার ২৭.১ শতাংশ। রাজ্যে ম্যাট্রিক বা হায়ার সেকেন্ডারি পাশের হার ১৩.৩ শতাংশ।

মমতার বন্ধু অমর সিং?

(১ পাতার পর)

সিংয়ের গুণের শেষ নেই। মমতা বোধ হয়, সেই কারণেই তাঁকে সিঙ্গুরে ডেকে এনে কৃষক আন্দোলন করছেন। তৃণমূল নেত্রীর রাজনৈতিক বুদ্ধি নিয়ে তাঁর দলের নেতাদেরই সংশয়ের শেষ নেই। তা না হলে সততার প্রতিভূ হিসাবে নিজেকে যে নেত্রী বার বার প্রমাণ করতে চান তিনি কখনও অমর সিং-দের মতো দালাল প্রজাতির নেতাদের সঙ্গে ঘর করতে পারেন! কে জানে, নিন্দুকেরা বলে, সঙ্গদোষে শতগুণ নাশে। অনেকে বলেন, সঙ্গী দেখেই কাউকে চেনা যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বশেষ সঙ্গী অমর সিংকে দেখে কেউ তাঁর বিচার করলে কী হবে? আজন্ম সিপিএমের বন্ধু অমর সিং-রা আবার প্রকাশ কারাতদের হুকুমেই মমতার মধ্যে বামপন্থা তৈরিতে সচেষ্ট নয়তো?

সিমি প্রধানের স্বীকারোক্তি

(১ পাতার পর)

রাজনীতি করতে চাইলেও তা হয়নি। অন্যদিকে কেরলের সিমি নেতা সিবলি, কর্ণাটকের হাফিজ ও আমিল পারভেজ, উত্তরপ্রদেশের কামারুদ্দিন কিন্তু ভারতজুড়ে নাশকতামূলক সন্ত্রাস ছড়াতেই সিমির পথ নির্দিষ্ট করে। নাগৌরি মধ্যপ্রদেশ পুলিশকে জানিয়েছে যে তার স্থানীয় সমর্থনের মজবুত ভিত্তি, বিভিন্ন পথে তহবিলের উৎস বিভিন্ন শহরে শহরে মজুত রয়েছে। তবে, আই এস আই-এর সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারটা নাগৌরি অস্বীকার করে গেছে। বলা বাহুল্য, দিল্লীর ভারত সরকারের নাকের ডগায় বসে পাক দূতাবাসে ভারতে ধ্বংসাত্মক কাজকর্মের যে নীলনক্সা প্রতিনিয়ত বানানো হচ্ছে সে ব্যাপারে এন ডি এ অথবা ইউ পি এ আমলে কোনও হেলদোল দেখা যায়নি। পাকিস্তান প্রেমে দিল্লী সরকারের ডগমগ অবস্থা। অথচ ওদিকে কাশ্মীরা সিংরা ৩০/৩৫ বছর পাকিস্তানের জেলে বন্দী থাকে, ভুল করে সীমা পার করে সবরজিৎ ফাঁসির প্রহর গোণে।

HB ®
INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS
HB ® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.
Authorised Distributor
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
15, College Street, Kol-12
Ph : 2241 7149 / 8174
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics
4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান
প্রতি সংখ্যা - ৪.০০ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য
সডাক্ - ২০০.০০ টাকা

গহনা যদি গড়াতে চান যে
কোনও স্বর্ণকারকে
সুপার
ক্যাটলগ দেখাতে বলুন
সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাক এণ্ড সন্স
১৫-ডি, গরাণ হাটা স্ট্রীট, কলি:-৬

সকল প্রকার স্টীল ফার্নিচারের জন্য যোগাযোগ করুন
Dass Steel Co.
Mirchak Road. - Malda
Ph. No. 266063

জননীজন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

পাকিস্তান আছে পাকিস্তানেই

প্রত্যাশামতোই পাকিস্তানে পালাবদল ঘটিয়াছে। এককালীন সামরিক একনায়ক জেঃ (অবঃ) পারভেজ মুশারফ পদত্যাগ করিয়াছেন। রাষ্ট্রপতি হিসাবে বিদায়বেলার ভাষণে স্বদেশবাসীকে তিনি বোঝাতে চাহিয়াছেন, তাহার জমানা গণতান্ত্রিক বিভিন্ন জমানার অপেক্ষা অনেক বেশি গণতান্ত্রিক। এযেন ভূতের মুখে রামনামের মতো। একজন আদ্যন্ত একনায়কতন্ত্রী যিনি নিজের হাতে দেশের সংবিধানকে বাতিল করিয়াছেন, যিনি নিজেই দুই দুইটি নির্বাচিত সরকারকে হেলায় খারিজ করিয়াছেন, এমনকী দেশের উচ্চতম ন্যায়ালয়ের প্রধান বিচারপতিকেও হেলায় খারিজ করিয়া দিয়েছেন, সেই মুশারফই গণতন্ত্রের জয়গান করিতেছেন। আসলে জন্মলগ্ন হইতেই পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে কোনও রাজনৈতিক দলই যথোচিত পরিচর্যা করে নাই। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো তো পাকিস্তানে গণতন্ত্রের ভিত্তি মজবুত না হইবার কারণ হিসাবে ভারতকেই দায়ী করিয়াছেন। কেননা, তাঁহার মতে, ভারতের ভয়েই পাকিস্তানী জনগণের আস্থা গণতন্ত্র অপেক্ষা সামরিক বাহিনীর প্রতিই বেশি।

মুশারফের পদত্যাগের পর পাকিস্তানের ভঙ্গুর গণতান্ত্রিক সরকার সেনাবাহিনী আই এস আই এবং সন্ত্রাসবাদীদের নিয়ন্ত্রণে কতটুক কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করিবে তাহা লইয়া বিস্তর সন্দেহ রহিয়াছে। কারণ পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আসিবার পর হইতেই ভারতের উপর সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। তাই সাম্প্রতিক পালা বদলের পালাকে 'পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ঘটনা' বলিয়া ভারত নিশ্চুপ থাকিতে পারে না। বাংলাদেশের মতো পাকিস্তান কখনও ভারতের বন্ধু রাষ্ট্র নয়। বরং শুরু হইতেই পাকিস্তান ক্রমান্বয়ে ভারত বিরোধী জিগির তুলিয়া চলিয়াছে। পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক সরকারই থাকুক, আর সামরিক স্বৈরাচারী শাসনই থাকুক, ভারতের পক্ষে তাহাতে কোনও হেরফের হয় না। বরং জে. মুশারফের সামরিক শাসনের আমলে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে একটি শান্তি প্রক্রিয়া চলিতেছিল তাহা এখন কার্যত স্তব্ধ। বস্তুত পাকিস্তান ও বাংলাদেশ — ভারতের দুই প্রতিবেশী দেশেই গণতন্ত্র সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নয়। কাজেই উভয় রাষ্ট্রেই বারবার সামরিক নায়কগণ গণতন্ত্রকে 'ক্যু' করিয়া দখল করিয়া থাকেন। সামরিক নায়কদের পরিণাম কী হয় তাহা ভালো করিয়া জানিয়াও পাকিস্তানী জনগণ বারবার সামরিক স্বৈরাচারী শাসকদের কবলে পড়িয়া হিমসিম খাইতেছে। মুশারফের ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। মুশারফ যখন বিদায় ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন দেশের বিভিন্ন স্থানে জনগণ জয়োল্লাসে ফাটিয়া পড়িয়াছিলেন।

দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রপতি মুশারফের বিদায় লইবার পর হইতে সন্ত্রাসবাদী সর্পগুলি যেন নিজেদের ফণা তুলিয়া দেশ ও জনগণের উপর বিষাক্ত ছোবল দিয়া চলিয়াছে। আর গণতান্ত্রিক জোট সরকার যেন সন্ত্রাসবাদীদেরকে মোকাবিলা করিবার কোনও দিশাই খুঁজিয়া পাইতেছে না। স্পষ্টত দেখা যাইতেছে ইতিপূর্বে সন্ত্রাসবাদের লক্ষ্য ছিল শুধুই সরকারি সম্পত্তি ও সরকারি লোকজন। কিন্তু ওরাটাউন ও ডেরা ইসমাইল খানের ঘটনায় সাধারণ মানুষও সন্ত্রাসবাদীদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হইয়াছে।

অর্থাৎ পাকিস্তানের পরিস্থিতি আরও জটিল হইয়া উঠিতেছে। পাকিস্তানে আশ্রিত তালিবানী জঙ্গিরাই ওই গণহত্যা করিয়াছে। প্রথমে তাহারা এই গণহত্যার দায় স্বীকার না করিলেও পরে তাহা স্বীকার করিয়াছে। তালিবানী মুখপাত্র মোল্লা ওমর নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিতে গিয়া বলিয়াছেন, উপজাতি অধ্যুষিত রাজৌর-এ পাক সেনাবাহিনী নিরীহ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করিবার প্রতিবাদেই বিস্ফোরণ ঘটানো হইয়াছে। এতদিন তালিবানী সন্ত্রাসবাদীদের সেনা শিবিরগুলিই লক্ষ্য ছিল। কিন্তু সেনাবাহিনীর হত্যার প্রতিবাদে সাধারণ ও নিরীহ মানুষকে কেন হত্যা করা হইল তাহা ঠিক বোঝা গেল না। রাষ্ট্রপতি পদ হইতে মুশারফের সরিয়া দাঁড়াবার পর দুইটি পর পর বিস্ফোরণে ঘটনা ঘটিল। ইহাতে মুশারফের সতর্কবার্তাই সত্যে পরিণত হইয়াছে। ইহা দেখা যাইতেছে যে পাক প্রধানমন্ত্রী গিলানীর নেতৃত্বাধীন জোট সরকার সন্ত্রাসবাদীদের তৎপরতার মোকাবিলায় একেবারেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে। অথচ ক্ষমতায় বসিবার পূর্ব হইতেই প্রধান দুই দল পি পি পি এবং পি এম এল (এন) সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে হুমকী দিয়া আসিতেছিল। কিন্তু ক্ষমতাসীন হইবার পর দেখা যাইতেছে উভয় দলই যেন মুষড়াইয়া পড়িয়াছে। শুধু তাহাই নহে, মুসলিম লীগ নেতা তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের সঙ্গে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন ও প্রধান বিচারপতি সহ বিচারপতিদের স্ব--স্ব পদে পুনর্বহাল করিবার ইস্যুতে বিরোধ এতটাই যে পি এম এল জোট সরকার হইতে সমর্থন প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছে। একদিকে তালিবানীদের নতুন করিয়া তৎপরতা বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে প্রধান রাজনৈতিক দলের মতানৈক্য — দুইই পাকিস্তানের সমূহ বিপদ ডাকিয়া আনিতে পারে।

পাকিস্তানের এই পরিবর্তিত পরিস্থিতি ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে প্রভাব ফেলিবেই। বিদেশ সচিব শঙ্করমেননের কথায় দুই দেশের সম্পর্ক এখন বেশ চাপের মুখে। কাবুলে ভারতীয় দূতাবাসে বোমা বিস্ফোরণ ও বাঙ্গালোর, আমেদাবাদে বোমা বিস্ফোরণের পর ভারত পাকিস্তানের দিকে আঙুল তুলিয়াছে। পাশাপাশি দীর্ঘদিন শান্ত থাকিবার পর নিয়ন্ত্রণ রেখার দুইধারে দুই দেশের মধ্যে গুলি বিনিময় আরও অস্বস্তির জন্ম দিয়াছে। অর্থাৎ পাকিস্তান ফিরিয়া গিয়াছে পুরনো পাকিস্তানেই। পাকিস্তান আছে পাকিস্তানেই।

এদেশের এই মুদ্রাস্ফীতি মানুষের তৈরি

তারক সাহা

গত ১৫ আগস্ট শেষ হওয়া সপ্তাহে দেশের মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে সাড়ে ১২ শতাংশ। ব্যাঙ্কগুলি আমানতের ওপর চড়া সুদ দিলেও এ যাবৎ জিনিসপত্রের দাম কম হওয়ার কোনও লক্ষণ নেই। বরং বেড়ে চলেছে। উৎসবের মরসুমে সাধারণ মানুষ জেরবার এই মুদ্রাস্ফীতিতে। তার ওপর কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের বেতন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত বাজারকে আরও উত্তপ্ত করবে। ফলে বেসরকারি সংস্থাগুলিতে যেসব মানুষ কাজ করে, যারা সরকার নির্দ্ধারিত ন্যূনতম মজুরি আজও পায় না তাদের হাল কীরকম তা সহজেই অনুমেয়।

কিন্তু সরকারি প্রতিশ্রুতি থেমে নেই। মাত্র চার মাস আগে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর দৃপ্ত ঘোষণা যে, এবারের তাঁর বাজেট দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে। সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে। সত্যিই তো সাধারণ মানুষ যাদের ক্রয়ক্ষমতা রয়েছে তাদেরই তিনি উপকৃত করেছেন। মাননীয় বিত্তমন্ত্রীর তালিকায় অগ্রাধিকার পেয়েছে গাড়ি, বাতানুকুল মেশিন, বৈদুতিন সামগ্রীসহ আমদানিকৃত ইলেকট্রনিক সামগ্রী। সস্তা হয়েছে এগুলি। উন্নয়নের এগুলিই তো হাতিয়ার! সরকারি বেতনবৃদ্ধির সঙ্গে ভোগ্যপণ্যের মূল্যহ্রাসের এক অদ্ভুত সাযুজ্য রয়েছে। বেড়ে যাওয়া বেতন দিয়ে দেশের ৫০ লক্ষ সরকারি বেতনভুক কর্মীরা ওইসব ভোগ্যপণ্য সস্তায় কিনবে, আর দেশের দরিদ্র্যসীমার নীচে বাস করা মানুষগুলি দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হবে এতে আর আশ্চর্য কী? ইতিমধ্যে চাল, ডাল, তেল, কাঁচা আনাজ, মাছ-মাংসের বাজারদর কোনও কোনও ক্ষেত্রে দ্বিগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে গত ৬ মাসে।

কিন্তু এমন কেন হল? যদি চিদাম্বরমের খাদ্যমূল্যবৃদ্ধি রোধ করা মুখ্য লক্ষ্য হবে তবে কেন সরকার সরকারি বন্টন ব্যবস্থা জোরদার করল না? কেন সরকার ভোজ্য তেল, ঘি, মাখন, মিল্ক পাউডারের মতো সামগ্রী যার বিদেশে দাম বেশী সেগুলোর ওপর আমদানি শুল্ক হ্রাস করলো না। উল্টে বরং দেশজ কৃষিপণ্য রপ্তানির ওপর অঙ্কুশ লাগালো। এটা পরিষ্কার নয় যে, একদিকে সরকার যখন বলছে বাজেট ঘাটতিকে গড় জাতীয় উৎপাদনের ২.৫ শতাংশ-এ সীমাবদ্ধ রাখা যাবে অন্যদিকে তখন আমদানি শুল্ক কমিয়ে এই ঘাটতিকে আরও স্ফীত করার কী যুক্তি থাকতে পারে? তবে কি সরকার নোট ছাপিয়ে এই ঘাটতি ও সরকারি কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির মতো বিশাল ব্যয়ভার মেটাবে? অর্থনীতিবিদদের আশঙ্কা এই দুই প্রক্রিয়ায় আরও জিনিসপত্রের দাম বাড়বে।

অন্যদিকে বিশ্বব্যাঙ্কের নির্দেশে অর্থমন্ত্রী আমদানি শুল্ককে কম করিয়ে দেশীয় রপ্তানিকে মহার্ঘ করে দিচ্ছেন। বিশ্বব্যাঙ্কের এক নির্দেশে বলা হয়েছে ভারত কৃষি পণ্য রপ্তানি (বিশেষত চাল, গম, ডাল, বজরা, ভুট্টা) বন্ধ করুক। পরিবর্তে আমদানি শুল্ক কমিয়ে প্যাকেটজাত খাদ্য আমদানি করুক। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, দেশে প্রচুর দুধ উৎপাদন হলেও পাউডার দুধ আমরা আমদানি করছি। এবং এটা কি যুক্তিসঙ্গত যে দুধে দেশ স্বনির্ভর হলেও গুঁড়ো দুধ আমদানি করতে শুল্ক হ্রাস করা দরকার?

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৮-০৯ সালের বাজেট পেশের সময় চিদাম্বরম বিরোধীদের অভিযোগ ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন যে, এবারের বাজেটে মুদ্রাস্ফীতি হবে না। কিন্তু বাজেট পেশ করার সময়ে যে মুদ্রাস্ফীতি ছিল ৫ শতাংশ-র মতো তা রকেটের মতো ক্ষিপ্র গতিতে সাড়ে বারো শতাংশ পৌঁছালো কীভাবে — অর্থমন্ত্রী জবাব দেবেন কি? এর কারণ হল মুখ্যত চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে কৃত্রিমভাবে শিল্পপুঁজিপতিদের অভাব সৃষ্টি করা। আসলে বাজারের ওপর সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণই নেই। কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে চাহিদা-যোগানের মধ্যে এক বৈষম্য সৃষ্টি করে লাভের গুড় ঘরে তুলছে একশ্রেণীর অসাধু শিল্পপতি আর মিডলম্যানরা। আমাদের মুদ্রাস্ফীতি আর জিনিসের চড়া দাম এক করে দেখলে চলবে না। বাজারে হঠাৎ করে কোনও যোগান বন্ধ হয়ে যায়নি, কিংবা দেশের ১২০ কোটি মানুষের হাতে আচমকা অনেক পয়সা এসে যায়নি যাতে করে এমন মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে। বাজারে অনিয়ন্ত্রিতভাবে মুনাফালোভী ব্যবসায়ীরা এই অবস্থার জন্য দায়ি।

এই মূল্যবৃদ্ধির অপর কারণ হল গণবন্টন ব্যবস্থায় সরকারি চরম ঔদাসীন্য। ইউ পি এ সরকার গত চার বছরে এ বিষয়ে কোনও লক্ষ্যই দেয়নি। সরকারি পোষ্য অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বিষয়টা তেমন গুরুত্ব দেবেন না। আজকের এই মূল্যবৃদ্ধির দায় অবশ্যই ইউ পি এ সরকারকে নিতে হবে। তাদের ভুলের মাশুল গুণছে দেশের সাধারণ মানুষ।

দেশের অসাধু ব্যবসায়ীরা যাদের হাতে প্রচুর অর্থ তারাই আজ দেশের অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, একবছর তেলের মূল্যবৃদ্ধির পর যখন আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমতে আরম্ভ করলো (২০০৬-র সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর এই কালখণ্ডে ব্যারেল পিছু তেলের দাম ৫৫ মার্কিন ডলারে নেমে এলো) তখন ইকনমিক জার্নালগুলি লিখলো যে, বিশ্বের তেল কোম্পানীগুলি প্রচুর অর্থ লগ্নী করেছে তেল উৎপাদন বাড়াতে এই অনুমান করে যে, অচিরেই তেলের দাম বেড়ে ব্যারেল পিছু একশো ডলারে পৌঁছবে। তারা বলল যে, যদি তেলের দাম পড়ে যায় তবে এই কোম্পানীগুলির প্রভূত ক্ষতি হবে। ইরাক পতনের পর আমেরিকা প্রকৃতপক্ষে তেলের বাজার কব্জা করে ফেলে। আমরা এখন দেখছি তেল কোম্পানীগুলি আসলে এই লগ্নীর ফলে প্রচুর মুনাফা লোটে আর তার ফল ভুগতে হচ্ছে গরীব দেশগুলিকে। আমেরিকা ও তার দোসর দেশগুলি বলে বেড়াচ্ছে যে, জৈব জ্বালানি তৈরি করতে গিয়ে প্রায় এক চতুর্থাংশ খাদ্যশস্য তাদের খরচ হওয়ার জন্যই এই খাদ্যসঙ্কট। কিন্তু এমন ব্যাখ্যা বিশ্বাস করার মতো কোনও কারণ নেই। অস্ট্রেলিয়ায় খরার ফলে ওই মহাদেশে যে গম উৎপাদন কম হয়েছিল তা চার বছর আগের কথা। সুতরাং বিশ্ব বাজারে যে খাদ্য সংকট তৈরি হয়েছে তা মূলতঃ মানুষের তৈরি, যাতে মুনাফাবাজরা চড়া দামে খাদ্য বেচে পয়সা বেশি রোজগার করতে পারে। এদিকে এক সম্মেলনে কোন্ডালিজা রাইস বলেছেন যে, বিশ্বে খাদ্যসংকটের জন্য দায়ি নাকি ভারত ও চীন। এই দু'দেশের মানুষ অধিক ভোজন করে।

কিন্তু এমন কথা এই মার্কিন কর্ত্রীর বলার কোনও যুক্তি নেই। কারণ ভারতের অভ্যন্তরীণ খাদ্য চাহিদা মেটাতে ভারত যথেষ্ট সক্ষম। নিজেদের চাহিদা মিটিয়েও বিশ্ব বাজারে ভারত চাল-গম রপ্তানি করে। ইতিমধ্যেই পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে ১৩৪ লক্ষ টন গম ও ২২৯ লক্ষ টন মজুত আছে। সংগ্রহ করা হয়েছে ১৫০ লক্ষ টন গম ও ২৭০ লক্ষ টন চাল। আগের পরিসংখ্যান এই সংগ্রহের অতিরিক্ত। সুতরাং দেশে আক্ষরিক অর্থে কোনও খাদ্য সংকট নেই।

এসব সত্ত্বেও কৃষি মন্ত্রক, অর্থ মন্ত্রক ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গৃহীত তিন দফা ব্যবস্থাও মুদ্রাস্ফীতি কমাতে পারেনি। বাস্তবে মুদ্রাস্ফীতিজনিত মূল্যবৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির দর কমলেও তা রয়ে যায়। আর এইখানেই সরকারি হস্তক্ষেপ চাই। এই মূল্যবৃদ্ধির জন্য দায়ি মজুত নয় বরং ফরওয়ার্ড ট্রেডিং। শপিং মলগুলিকে আজ যখন কাঁচা আনাজ, চাল-গম-ডাল-এর মত নিত্য ব্যবহার্য জিনিস পাওয়া যাচ্ছে সেখানে নিশ্চয় দাম অনেক বেশি দিতে হবে বাজারের দোকানগুলি থেকে। কিন্তু এর ফয়দা লুটছে কর্পোরেট হাউসগুলি যারা চালাচ্ছে শপিং মলগুলি। একদিকে উৎপাদক যেমন তার উৎপাদন মূল্যের সঠিক মূল্য পাচ্ছে না, অন্যদিকে

(এরপর ১৪ পাতায়)

> "দুর্ভাগ্য হল যে, ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করছে না। দ্রব্যমূল্য নিয়ে এদের তেমন মাথাব্যথা নেই। এর অন্যতম কারণ হল নির্বাচনে সব দল এইসব মুনাফাখোর কর্পোরেট হাউসগুলি থেকে অর্থ পায়। সুতরাং কোনও রাজনৈতিকদল এদের বিরুদ্ধে সরব হতে পারে না সঙ্গত কারণেই। এর নজির মিলেছে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারকে টিকিয়ে রাখতে যে টাকার লেনদেন হয়েছে তা যুগিয়েছে এই কর্পোরেট সংস্থাগুলি।"

এই সময়

মোদির চমক

সন্ত্রাসবাদের মতো ভয়াবহ সমস্যার মোকাবিলায় নজির সৃষ্টি করল গুজরাট সরকার। গত ১৫ আগস্ট গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সন্ত্রাসবাদের প্রতিরোধে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা ঘোষণা করেছেন। রাজ্য তথা দেশের সুরক্ষার কথা মাথাই রেখেই তাঁর এই ঘোষণা। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের সন্ত্রাসের মোকাবিলার প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই সরকার পাঠ্যসূচি তৈরির দায়িত্ব সুরক্ষা বিশেষজ্ঞদের দিয়েছেন। অধ্যাপক হিসাবে অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার, ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ ও সুরক্ষা বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করা হবে বলে জানিয়েছেন। দেশের ৬২ তম স্বাধীনতা দিবসে তাঁর এই সিদ্ধান্ত জাতীয়তাবাদী দেশভক্ত মানুষের প্রশংসা অর্জন করেছে।

বনধের ব্যয়

বনধের দিন কলকাতার আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত ব্যয় হল পাঁচ লক্ষ টাকা। কলকাতা পুলিশ কমিশনার গৌতমমোহন চক্রবর্তী স্বরাষ্ট্র সচিবকে একটি চিঠিতে এই টাকার কথা জানিয়েছেন। এদিন কলকাতা শহরে ১২ হাজার পুলিশ কর্মী নামানো হয়। প্রত্যেকের জন্য ৪০ টাকা খরচ হয়। গাড়ির চালকদের পিছনেও বেশ কিছু টাকা ব্যয় হয়। যা সর্বসাকুল্যে ৫ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। কাজ নয়, কাজ বন্ধ রাখতেই এই দিন ৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গেল। এধরনের অপব্যয় যে রাজ্যের বেহাল আর্থিক অবস্থাকে আরও শোচনীয় করবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

জাতীয় পতাকার মর্যাদা

জাতীয় পতাকার অবমাননার বিরুদ্ধে অভিনব প্রতিবাদ জানাল গ্রামবাসীরা। তাদের মতে, কোটি শহীদের জীবনের বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীনতাকে কোনভাবেই অপমান করাটা মেনে নেওয়া যায় না। ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়ায়। পুরুলিয়ার বরাবাজার ব্লকের তালটাঁড় প্রাথমিক বিদ্যালয় গত ১৫ আগস্ট ৬২ তম স্বাধীনতা দিবসের দিন জাতীয় পতাকা না তোলায় গ্রামবাসীরা একজোট হয়ে ওই স্কুলে তালা ঝুলিয়ে দেয়। তাদের দাবি, স্কুল কর্তৃপক্ষের এই কাজ গর্হিত অপরাধ। তারা এজন্য তাদের ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানিয়েছে। অবশেষে এস আই-এর সাহায্যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে রাজ্যের শিক্ষাবিদদের মতে স্কুলের এই ঘটনায় ছাত্র সমাজের কাছে আমরা ছোট হয়ে গেলাম।

এন সি ই আর টি-র চক্রান্ত

এন সি ই আর টি-র পাঠ্য পুস্তকে আবারও একবার হিন্দু বিরোধী পাঠ্যসূচি অন্তর্ভুক্ত করার চক্রান্ত ধরা পড়ল। কচিকাঁচাদের মাথাতেও হিন্দু বিরোধী চিন্তাধারা ঢুকিয়ে দেওয়ার এই ষড়যন্ত্রকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না বুদ্ধিজীবী মহল। এন সি ই আর টি-র অষ্টম শ্রেণীর 'সামাজিক বিজ্ঞান' পাঠ্যে পড়ানো হচ্ছে হিন্দুদের দ্বারা মুসলিমদের সবদিক থেকে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। শুধু তাই নয়। এই বই-এরই কয়েকটি অধ্যায়ে সাচার কমিটির গুণকীর্তনও করা হয়েছে। সামাজিক বিজ্ঞানের 'মুসলিম মার্জিনালাইলেজশন' নামক অধ্যায়ে কচিকাঁচাদের কাছে মুসলিমদের মহান ও হিন্দুদেরকে হীন হিসাবে দেখানোর চেষ্টা করেছে এন সি ই আর টি।

বসে বসে মাইনে

এক অভিনব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল রাজ্যের ভূমি সংস্কার দপ্তর। এবার তহসীলদারদের বসে বসে মাইনে নেওয়ার পাকা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকার খাজনা আদায়ের দায়িত্ব ভূমি সংস্কার অফিসার ও কর্মচারীদের হাত থেকে নিয়ে রিলায়েন্স কমিউনিকেশন লিমিটেড এবং অন্য একটি বেসরকারি সংস্থাকে দিতে চলেছে। এর ফলে ভূমি সংস্কার দফতরের অফিসারদের কোনও কাজ করতে হবে না। আবার তারা যাতে বে-রোজগারী না হয়ে পড়ে সেজন্য তাদেরকে চাকরিতে বহাল রাখা হচ্ছে। মহাকরণ থেকে সম্প্রতি এমনই নির্দেশ জেলার ভূমি সংস্কার দপ্তরগুলিতে পাঠানো হয়েছে। বেসরকারি সংস্থাগুলোই হাওড়া, হুগলি, বাঁকুড়া, পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ চবিবশ পরগণা, মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, কোচবিহার, দার্জিলিং জলপাইগুড়ি ও বীরভূমের খাজনা আদায়ের দায়িত্বে থাকছে।

ডাক মিউজিয়াম

সাধারণ মানুষের কাছে ডাক বিভাগ বহু আগেই সংগ্রহশালায় পরিণত হয়েছে। এবার খোদ ডাক বিভাগই তাদের পিছিয়ে পড়া ইতিহাসকে স্বীকার করে নিল। ২০০৭-২০০৮ সালের ডাক বিভাগের বার্ষিক রিপোর্টে দেখা গেছে খাম, পোস্ট কার্ড সহ চিঠি প্রদানের অনান্য পরিষেবাগুলিও ৫০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। গত আর্থিক বৎসরে ১২৪৯.৫ কোটি টাকা ডাক-বিভাগের ঘাটতি হয়েছে। স্ট্যাম্প বিক্রি সহ চিঠি পরিষেবায় আয় কমেছে ১১.৪ শতাংশ। শুধু যে বিক্রি বা ঘাটতি এমন নয়, অনাদায়ী অবস্থায় পড়ে থাকার টাকার পরিমাণও কিছু কম নয়। ডাক বিভাগ বর্তমান মোবাইল পরিষেবার বাড়বাড়ন্তকে এই সবের মূল কারণ বলে চিহ্নিত করলেও সাধারণ মানুষের মতে, পোস্ট অফিস যদি সঠিক পরিষেবা প্রদান করত তাহলে ঘাটতি অন্তত হত না। এছাড়া ডাক বিভাগের অর্থ তছরূপ, বকেয়া পড়ে থাকা, হিসাবে ভুল-ভ্রান্তি গলতি এসব তো রয়েছেই।

ভক্তের ভগবান

ঝিনুকের মধ্যে গজানন গণেশের মূর্তি তৈরি করে চমক সৃষ্টি করলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিজ্ঞানী ডঃ অজয় সোনকর। ঝিনুক থেকে মুক্ত সৃষ্টির সময় তিনি তিনবার মুক্তোটিকে শল্য চিকিৎসা করেন। শল্য চিকিৎসার দ্বারাই তিনি ঝিনুকের মধ্যে গণেশের প্রতিকৃতিতে মুক্তো তৈরি করেন। তবে তা যে খুব সহজ নয় তা অন্যান্য বিজ্ঞানীরা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন। মাত্র ৪২ মিলিমিটারের গণেশ মূর্তি। ডঃ অজয় সোনকর তার সৃষ্টিতে স্বভাবতই খুশি। ভক্তের হাতেই যে ভগবান ধরা দেয় তা সোনকরের সৃষ্টিতেই প্রমাণিত।

নিশানায় ব্যাঙ্ক

ভারতে জাল নোট ছড়াতে আই এস আই বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ককে কাজে লাগাচ্ছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ এই বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। গোয়েন্দাদের ধারণা আই এস আই ভারতের অর্থনীতিকে পঙ্গু করতে পশ্চিমবঙ্গসহ উত্তরপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি রাজ্যের ব্যাঙ্কগুলিকে প্রাথমিকভাবে নিশানা করেছে। গোয়েন্দা দপ্তর এই কারণে ইতিমধ্যেই ব্যাঙ্কগুলিকে সতর্ক করে দিয়েছে। সেই সঙ্গে গোয়েন্দারা ব্যাঙ্কের হাজার ও পাঁচশো টাকার নোটগুলি পরীক্ষার কাজ শুরু করেছে। চলতি বছরে উত্তরপ্রদেশসহ বেশ কয়েকটি রাজ্য থেকে ব্যাপক জাল টাকাও উদ্ধার হয়েছে। জাল নোট ছড়িয়ে দিতে তাই আই এস আই ব্যাঙ্কগুলিকেই সহজ পথ হিসাবে বেছে নিচ্ছে।

খাচ্ছে কিন্তু গিলছে না

হাফিজ ইব্রাহিম

রোদে পোড়া ইঁটের পাঁজা
তার উপরে বসল রাজা
ঠোঙা ভরা বাদাম ভাজা
খাচ্ছে কিন্তু গিলছে না

ছড়াটার শেষ পংক্তিতে এসে চোখ আটকে গেল। প্রথম যখন পড়ি অর্থাৎ শৈশবে, তখন রাজার ব্যাপার-স্যাপার দেখে খুব হাসি পেত। কিছুদিন আগে পর্যন্ত রস পেয়েছি, এখন আর পাই না। এখন মনে হয় সুকুমার রায় তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছিলেন — স্বাধীনতার ষাট বছরের পরেও সর্বশিক্ষার নামে কি সর্বনাশা শিক্ষা পশ্চিমবঙ্গে চলবে। তার সঙ্গে 'মিড ডে মিল' মিলে গিয়ে শিক্ষা বস্তুটির দেশান্তরি হতে আর বেশি বাকি নাই। প্রায় প্রতিটি প্রাথমিক স্কুলে মিড ডে মিলের ছবি দেখলে এই মন্তব্যের যথার্থতা উপলব্ধি করা যাবে। খড় পাতার ছাউনি দিয়ে রোদ বৃষ্টি অবাধে গলে পড়ছে এমন রান্না ঘরে প্রাথমিক ছাত্র শিশুদের রান্না হচ্ছে। সেই বিবর্ণ খাদ্যবস্তু ছাত্র-ছাত্রীর থালায় পড়ছে। শিশুরা খাচ্ছে কিন্তু তাদের খাওয়ার আনন্দ নাই। গরীব ছাত্র-ছাত্রীরা বাড়িতে যে খাবার পেত তার মধ্যে দারিদ্র্যের চিহ্ন থাকে হয়তো কিন্তু সামনে থাকা মায়ের আদর আর তাঁর পেট ভরানোর প্রত্যাশা অতি সাধারণ খাবারকেও রুচিকর করে তোলে। কিন্তু স্কুলের ভোজনশালায় চাকরি রক্ষার তাগিদ যত বেশী, খাওয়ানোর তাগিদ একেবারেই শূন্য। অতএব শিশুরা থালা ভরা মিল খায় কিন্তু গিলতে পারে না। অন্যদিকে মুখ্য উদ্দেশ্য যদি শিক্ষা বিস্তার হয় তবে হলফ করে বলা যায় কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য সাক্ষরতা বৃদ্ধি এখন গৌণ, মূল লক্ষ্য ভোজনের দিকে। দিনে দিনে মিড-ডে মিলের যে অবস্থা দাঁড়াচ্ছে আর কিছুদিন পরে মুখ্য এবং গৌণ দুই উদ্দেশ্য বরবাদ হয়ে যাবে। পড়াশোনার সময় চুরি করে এই ভোজন ব্যবস্থা। ক্রমে এও দাঁড়িয়েছে একটা বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে। ছাত্র সংখ্যা বাড়ার পরিবর্তে কমছে। যারা একান্ত ভাবে লেখাপড়া করতে আসছে তারাও বঞ্চিত হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে এখনকার এই আলোচনা।

গত ৮ জুলাই ২০০৮-এর একটি বিখ্যাত ইংরাজী দৈনিকে একটি ছবি প্রকাশিত হয়েছিল। একটি বাচ্চা মেয়ে তার এক হাতে বই খাতা, অন্যহাতে একটি থালায় কিছু খাবার কাঁধে রেখে নিয়ে যাচ্ছে। ছবিটির উপরে যা লেখা আছে তা বাংলা করলে দাঁড়ায় — দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে ছাত্রেরা স্কুল থেকে পালাচ্ছে। বিস্তৃত সংবাদে পশ্চিমবঙ্গের মাত্র কয়েকটি স্কুলের তথ্য দেওয়া আছে। দেওয়া আছে স্কুলের প্রধান শিক্ষক কী বলছেন। অভিভাকদের মন্তব্য কী। ছাত্ররাই বা কী বলছে। সংবাদপত্রের মূল্যবান কলামে সামান্যতম বিবরণ আছে মাত্র। এই বিবরণ পড়লে মনে হবে যেন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিই এর মূল কারণ। মিড-ডে মিলের গুণগত মানের উপর কোপ ফেলেছে কেবল মাত্র দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। এই সিদ্ধান্ত থেকে একটা প্রশ্ন অবশ্যই উঠে আসে—যারা পড়াশোনা করতে আসে তাদের মূল উদ্দেশ্য হবে পড়াশোনা। মিলের দিকে তারা নজর না দিলেই পারে। যখন মিড-ডে মিল ছিল না তখন যারা পড়তে আসতো তাদের সংখ্যা কমল কেন? তবে কি পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত অভিভাবক মিডডে মিল পাবে বলেই ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠান? তবে কি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য ভোজন?

অস্বীকার করার উপায় নাই যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে। কিন্তু এর জন্য সঙ্গতি সম্পন্ন বাড়ির ছেলেমেয়েরা স্কুল বন্ধ করবে এর যুক্তি কি? তার মানে স্কুলে আসার মূল উদ্দেশ্য খাওয়া। এমন তো কথা ছিল না। কর্তৃপক্ষ নাকি সমীক্ষা করে দেখেছেন যথাসময়ে খেতে না পাওয়ার জন্য ছেলে-মেয়েরা স্কুলে আসতে পারে না। তাই চালু হল দুপুরের খাওয়া। প্রতিটি স্কুল প্রতিদিন একটা ভোজ-বাড়ির আকার ধারণ করল। সর্বনিম্ন পঞ্চাশ ষাট জন থেকে সর্বোচ্চ আড়াইশ তিনশ ছেলেমেয়ের প্রতি দিনের ভোজনের ব্যবস্থা তো কম ব্যাপার নয়। সবার আগে দায় পড়ল প্রধান শিক্ষকের উপর। তিনি একাধারে বাজার সরকার অন্যদিকে ভোজ বাড়ি কর্তা। ওদিকে যাদের জন্য আয়োজন তারা সবাই শিশু। একটু বেশি বেলা হয়ে গেলে ওপর থালা বাজাতে শুরু করে দেবে। অতএব মাননীয় প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকা কিংবা এখনকার সহায়িকা কখনও চাল ধুচ্ছেন কখনও বা উনুনে জ্বালানি যুগিয়ে দিচ্ছেন, যাঁরা রান্না করছেন তাঁদের তাড়াতাড়ি করতে অনুরোধ করছেন। তাঁর যা প্রধান কাজ শিক্ষকতা সেটা কিন্তু মিড-ডে মিল চালু হওয়ার পর থেকে শিকেয় উঠে গেছে। এর উপর আছে জ্বালানি যোগাড়, তরিতরকারি সংগ্রহ, চাল তোলা, প্রতিদিনের হিসেব সংরক্ষণ ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ শিক্ষকের শিক্ষাদানেরই সময় নাই। এত সব করে যে মিল শুরু হয়েছিল — ভাত মাছ ভাজা সয়াবিন চাট্‌নি দিয়ে আজ তা দাঁড়িয়েছে খিচুড়ি ও আলুভাজায়। ৮ জুলাইয়ের দৈনিকের সংবাদ অনুসরণ করেই এটা বলা হল। মফঃস্বলের গ্রামের স্কুলের অবস্থা আরও শোচনীয়। পঞ্চাশের মন্বন্তরে ইংরেজদের খোলা লঙ্গরখানার খাবার যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা শিশুদের এখনকার খাওয়ার দেখলে সে কথাই মনে করবেন। খোঁজ নিয়ে দেখা যাচ্ছে অনেক স্কুলকেই আগাম খরচ দিয়ে মিলের ব্যবস্থা চালু রাখতে হচ্ছে। সব স্কুলের কর্তৃপক্ষের দ্বারা এটা সম্ভব নয়। এদের অবস্থা আরও করুণ। আগেই বলা হয়েছে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এর কারণ। প্রশ্ন আসে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি তো সরকারের জ্ঞাতসারেই। মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারলে খরচের টাকার অঙ্কও বাড়াতে হবে। কেননা লক্ষ লক্ষ শিশুর খাদ্য পুষ্টি অসুখ-বিসুখ এর উপর নির্ভর করছে। নির্ভর যোগ্য সংবাদ এখনও পাওয়া যায়নি যে মাথা পিছু খরচের অঙ্ক বেড়েছে। মাছ থেকে কমতে কমতে খিচুড়ি সয়াবিনে এসে ঠেকেছে। অতএব বাড়াবাড়ি শোনালেও মিড ডে মিলকে এখন লঙ্গরখানা বলাই যায়। বাচ্চারা এখানে আর খাওয়ার আনন্দ পাচ্ছে না যারা শুধু খেতেই আসত তারা আসা বন্ধ করে দিচ্ছে। যারা পড়তে আসে এবং খাবার খায়, তারা নিমরাজি হয়ে এখন খাচ্ছে। কিছুদিন পরে ওরাও আর খাবে না, কারণ পোকা চালের ভাতে পোকা সেদ্ধ হচ্ছে, সয়াবিন তরিতরকারিতেও পোকা মিলছে, কয়েকদিন আগে এক বেতার সাক্ষাৎকারে তা জানা গেল। এর সঙ্গে এও বোঝা গেল যে শিশুদের খাবার যে সাবধানতায় তৈরি করা দরকার তার যথেষ্ট ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। তাহলেও খাওয়া এবং খাওয়ানো নিয়ে শিক্ষক ছাত্র যে ভাবে ব্যস্ত থাকেন তাতে পড়ানো

(এরপর ১৪ পাতায়)

Ganesh Raut (B.Com)
Govt. Authorised Agent **L.I.C.I.**
Contact For Better Service
2521-0281, 94323-05737

চিন্তাশীল মানুষের মনের সঙ্গী
চিন্তাবিদ "শিবপ্রসাদ রায়ের" অসাধারণ রচনাবলীর নতুন সংস্করণ।
প্রকাশকঃ তপন কুমার ঘোষ
অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে।
প্রাপ্তিস্থান তুহিনা প্রকাশনী
১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা - ৭৩
ফোন ঃ ২৩৬০-৪৩০৬, মো ঃ ৯৮৩০৫৩২৮৫৮
সব বুক স্টলকে আকর্ষণীয় হারে কমিশন দেওয়া হয়।

রাজ্য রাজনীতি

সি পি এম ধনিক-বণিকদের হুকুমে নতজানু হচ্ছে

নিশাকর সোম

এরাজ্যে এখন প্রধান আলোচ্য সিঙ্গুরের টাটা-কারখানায় ৪০০-একর জমি ফেরত দেওয়া। ইতিমধ্যে এই বিষয় নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুই সিপিএম নেতা তথা মুখ্যমন্ত্রী ও শিল্পমন্ত্রী তৃণমূলকে কাকুতি-মিনতি করে চলেছেন। কারণ একটাই — টাটারা শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেনকে চাপ দিয়েছে যাতে তৃণমূলের সঙ্গে আলোচনা করে বিষয়টির নিষ্পত্তি করা যায়। আলোচনাতে তৃণমূল পরিষ্কার বলেছে, ৪০০-একর জমি ফেরত দিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী-শিল্পমন্ত্রী তৃণমূল নেতাদের কাগজপত্র এবং তাদের মতামত দেবার কথা বলেছেন। তৃণমূল নেতৃবৃন্দ - বুদ্ধবাবু নিরুপমবাবুর কাছ থেকে টাটার সঙ্গে চুক্তির কপি চেয়েছেন। তৃণমূল নেতৃবৃন্দের অভিমত হল, টাটাদের শর্তেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার চুক্তি করেছে। সেই শর্ত অনুযায়ী টাটারা নাকি বহু সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। সুবিধাগুলির মধ্যে সস্তায় জমি, সস্তায় বিদ্যুৎ প্রভৃতির ব্যবস্থা এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত।

এক সময়ে কমিউনিস্টরা টাটা-বিড়লাদের বিরুদ্ধে স্লোগান দিত — "কংগ্রেস রাজের দেখো হাল — টাটা বিড়লা লালে লাল।' আজ সেটা উল্টে বলা যায় — সিপিএম-এর দেখো হাল — টাটা, গোয়েঙ্কা হুকুম চালায়। টাটাদের চুক্তির স্বচ্ছতা সম্পর্কে জনমনে যথেষ্ট সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে। সিপিএম বলেছে, কেন্দ্রের ইউপিএ সরকার দেশটাকে আমেরিকার কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে।

এখন দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটাকে টাটা প্রমুখ শিল্পপতিদের হাতে সিপিএম সঁপে দিচ্ছে। আজকে সিপিএম-এর জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল মিত্রশক্তি হল দেশি বিদেশি পুঁজিপতিরা। আর শত্রু হল শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্তরা। সিপিএম-এর পৃষ্ঠপোষক শিল্পপতি গোষ্ঠী নির্বাচনে ব্যাপক অর্থের ভেল্কি দেখিয়ে — সিপিএম-কে বার বার গদীতে বসাচ্ছে। কারণ তাঁরা জানেন, সিপিএম হল পোষা ময়না, যেমন বুলি শেখানো হবে তেমনই বলবে, এটাই বর্তমানের ইন কিলাব।

এদিকে বুদ্ধ-নিরুপম-এর অপরিণামদর্শিতার ফলে সালিম গোষ্ঠীর বারাসাত-হলদিয়া রাস্তার প্রকল্পটি বাতিল হয়ে গেলো। বস্তুত বুদ্ধ-নিরুপম ভয় পেয়েছেন। তাই গ্লোরিয়াস রিট্রিট। এদিকে তৃণমূলের ধরণা কর্মসূচীতে সোমেন মিত্র'র নবগঠিত দল যোগ দিচ্ছে। সমাজবাদী পার্টির অমর সিং যোগ দিয়ে তৃণমূলকে ইউপিএ-এর দিকে টানার চেষ্টা করবেন। সিঙ্গুর প্রসঙ্গে আর একটা কথা উঠে এসেছে। তা'হল — জমির দালালরা বলেছিল যে তাঁরা টাটাদের জমি কিনিয়ে দেবেন। কিন্তু বুদ্ধ-নিরুপমদের বাধায় তা সম্ভব হয়নি। টাটার জমির জন্য দালালদের কাজটা কি তবে রাজ্য সরকার করলেন? সিপিএম এক ভয়াবহ পথে চলে গেছে। আগামী দিনে সার্বিক বিরোধী ঐক্য হলেই সিপিএম সিংহাসনচ্যুত হবে। এ-ব্যাপারে সিপিএম-এরই বহু লোক সাহায্য করবেন। সিপিএম এবার রবীন্দ্র নামাঙ্কিত সদন শিল্পপতিগোষ্ঠীদের হাতে 'বিক্রি' (তদারকি)-তে দিয়ে দিচ্ছে। রাজ্যের ৩২টি রবীন্দ্র সদন শিল্পপতি গোষ্ঠীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে। এই সব সদনে শিল্পপতিরা ব্যবসায়িক মল বসাবেন। এমনকী সিনেমা হাউস — রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা করবেন। রবীন্দ্রনাথও পুঁজিপতিদের হাতে থাকবেন।

এই সরকার তো রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার চুরির কোনও কিনারা করতে পারিনি। এখন শোনা যাচ্ছে শান্তিনিকেতন এবং জোড়াসাঁকো থেকেও রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি বিজড়িত বহু জিনিসপত্র চুরি (?) হয়ে গেছে। এক সময়ে রবীন্দ্রনাথ-কে কমিউনিস্টরা বুর্জোয়া কবি বলেছিলেন (ভবানী সেনগুপ্ত রবীন্দ্র গুপ্ত নামে লিখেছিলেন)। এ-রাজ্যের সংস্কৃতি মন্ত্রী হলেন বিদগ্ধ সংস্কৃতিবান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর রাজত্বেই গ্রামে-গঞ্জে শহরে 'নীলছবি' রমরম করে চলছে। চলছে অন-লাইন জুয়া। যুবশক্তিকে এদিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে— যাতে তাঁদের প্রতিবাদী মেরুদন্ডটি ভেঙে যায়। তাই গ্রামে গ্রামে ঢালাও দেশি মদের দোকান খোলা হচ্ছে, অবাধে লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে শুধু কিছু টাকার বিনিময়ে। ঠিক এরই সঙ্গে তাল মিলিয়ে রবীন্দ্র সদনের ব্যবসা চালু হচ্ছে।

আজকে সি পি এম নেতারা শিল্পপতিদের কেমন মানছেন তাঁর প্রমাণ পাওয়া গেল রাজ্যের এক বণিক সংস্থার সভায় সিপিএম-এর পলিটব্যুরোর সদস্য এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত রাজ্য সভার সদস্য ইয়েচুরির আমতা আমতা বক্তৃতাতে। বাস্তবে বণিকমহল বন্ধ করার বিরুদ্ধে

রতন টাটা

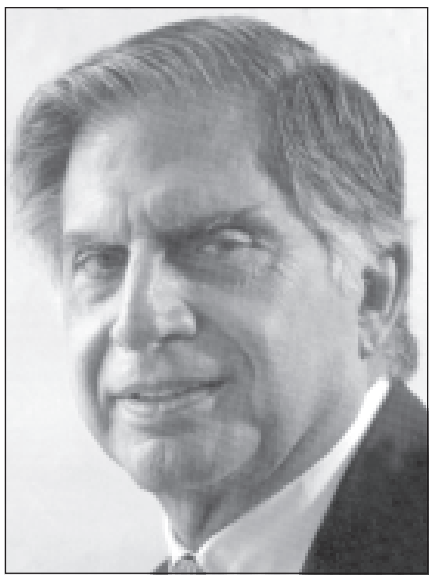

ইয়েচুরিদের তীব্র সমালোচনা করেছে। প্রতিটি শিল্পসংস্থার এম ডি-রা ইয়েচুরিকে কোণঠাসা করে দিয়েছিল। ইয়েচুরি অ্যাপলজিটিক হয়ে নিজেদের সম্বন্ধে আত্মরক্ষামূলক বক্তব্য রেখেছেন। এটাই প্রমাণ করে যে সিপিএম আজ সমাজের কোন অংশের দিকে পার্টির স্বার্থে কাজ করছে। মার্কস্-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন মুখে আর অন্তরে তাদের দেবতা হল শিল্পপতিরা। আজকের সিপিএম পুঁজিবাদের ফেরিওয়ালা।

বুদ্ধ-নিরুপম-সূর্য-গৌতম-কে বিধানসভার আবাসন কমিটি বিপদে ফেলেছে। এই কমিটির রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে গৌতম দেব বিধানসভায় দেওয়া আশ্বাসের কোনও কাজ করেননি। আর পশ্চিমবঙ্গ সরকার আশ্বাসের বেশিরভাগ কাজই করেননি, এসব রিপোর্টে বলা হয়েছে। ধন্য-

(এরপর ১৫ পাতায়)

অ ঢে রকম

কর্মক্ষেত্র

মনোহরপুকুরের বস্তি থেকে ধাপা

নির্মল কর ।। শৈশব কেটেছে ছোটনাগপুরের পাহাড়ে। লেখাপড়ায় হাতেখড়ি তাঁর মা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরির কন্যা পুণ্যলতা চক্রবর্তীর কাছে। কোনও স্কুলে লেখাপড়া না করেও কলকাতা

কল্যাণী কার্লেকার

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ-তে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়েছিলেন কল্যাণী কার্লেকার। পরবর্তীকালে শিক্ষাবিদরূপে সুখী ও প্রাচুর্যের জীবনে গা না ভাসিয়ে সমাজসেবিকা রূপে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন।

বাড়িতে নানা ধরনের প্রচুর বই, ছেলেবেলা থেকে বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনার অবাধ সুযোগ ছিল। যখন যা পড়তে ইচ্ছে হত পড়ে ফেলতেন। মায়ের কাছে পড়েছেন কীট্স, শেলি, ব্রাউনিং, টেনিসনের কবিতা আর শেক্সপিয়ারের নাটক।

১৯২৮-এ প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পাস করেন কল্যাণী কার্লেকার। ডায়সেশন কলেজ থেকে ইংরেজিতে স্নাতক হন। সেই ডায়সেশন কলেজ আজ আর নেই। কারণ, বিলেত থেকে প্রায় প্রতিটি বিষয়ে অধ্যাপক এনে পড়াতে হত বলে খরচ চালাতে না পেরে কর্তৃপক্ষ কলেজটাই তুলে দিলেন।

কল্যাণী কার্লেকার শিক্ষকতাকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেই কর্ম প্রতিভা এবং সুদক্ষ প্রশাসিকার সাক্ষর রাখতে শুরু করলেন। ১৯৩৪ থেকে তিনি একে একে গড়ে তুললেন ভিক্টোরিয়া কলেজের বাংলা বিভাগ, স্কটিশ চার্চ কলেজের ভাষা শিক্ষা বিভাগ এবং হেস্টিংস-এর ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন ফর উইমেন্স।

শুধু শিক্ষাজগতে তাঁর কর্মপরিধিকে সীমিত রেখে সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি কল্যাণী কার্লেকার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ সময়ে মানুষের দুঃখ-কষ্ট, অনাহার তাঁকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। তাই ন্যায্য দামে চাল-ডাল-তেল কেরোসিন কয়লা বিতরণের জন্য বালিগঞ্জে একটি কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি চালু করেছিলেন। পরন্তু ওই টালমাটাল রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে ১৯৪২-এ বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায়ের র‍্যাডিকাল ডেমোক্র্যাট সংগঠনের সঙ্গেও তিনি যুক্ত হয়ে পড়েন। সেখানেই পরিচয় হয় গোবিন্দ বিনায়ক কার্লেকরের সঙ্গে। এবং কিছুদিন পর তাঁরা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। স্বামীর নিরলস সহায়তায় কল্যাণীর মধ্যে সমাজ সেবার নিরুদ্ধ স্বপ্ন প্রস্ফুটিত হয়ে উঠতে লাগল। চল্লিশের দশক থেকে শুরু করে তাঁর ক্রিয়াকর্মের ব্যাপ্তি মনোহরপুকুর বস্তি অঞ্চল থেকে ধাপার দুর্গন্ধযুক্ত প্রান্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। ধাপা ও চৌবাগায় নোংরা ঘেঁটে কাগজ কুড়িয়ে যেসব ছেলেমেয়ে কোনও রকমে জীবনধারণ করে;যারা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত, তাদের মধ্যে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, জ্ঞানের আলো, স্বাস্থ্য-চেতনা এবং শিল্পবোধ জাগিয়ে তোলেন। ১৯৮৫ সালে অনাথ ভবঘুরেদের জন্য মতিলাল নেহরু রোডে একটি 'হোম' গঠন করেন, যেখানে শতাধিক অসহায় মানুষ আশ্রয় পেয়েছে।

এত করেও কল্যাণীর শরীর থেকে জংলি গন্ধ যেতেই চায় না। কারণ, অশিক্ষিত হত-দরিদ্র বিপন্ন মানুষ তাঁকে প্রতিনিয়ত হাতছানি দিয়ে ডাকে। তাই অধ্যাপনা থেকে অবসর নিয়ে মনোহরপুকুর রোডে শুরু করেন 'গার্ডেন ফর চিলড্রেন' নামে একটি স্কুল। এটি এখন পুরদস্তুর সরকারি অনুদানে চলা প্রাইমারি স্কুল। রোজ সন্ধ্যেয় সেখানে ত্বপ্স-ন্দ্রপ্সভজপ্পপ্ত ড্রস্তুত্বন্ত্বব্ধনপ্স-এর ক্লাসও বসে। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েরা যাতে কিছু রোজগারও করতে পারে তার জন্যও রয়েছে সেলাই, বাঁধাইয়ের প্রশিক্ষণ। এসব কর্মযজ্ঞের জন্য আগে কিছু বিদেশি অর্থ সাহায্য পাওয়া যেত। প্রতি বছর 'খ্লন্দ্বভজব্দন্দ্রব্দ ডডন্দ্লন্দ্বপ্তপ্সস্নপ্পন্দ্ধব্ধ ট্রনস্তু' নামে ব্রিটিশ সরকার বিরাট অঙ্কের যে-টাকা পাঠান, নানা ঘোঁট এবং রাজনৈতিক প্যাঁচে সে অর্থ এখন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ফলে ব্যাহত হচ্ছে কল্যাণী কার্লেকারের জীবনমুখী সংগ্রাম।

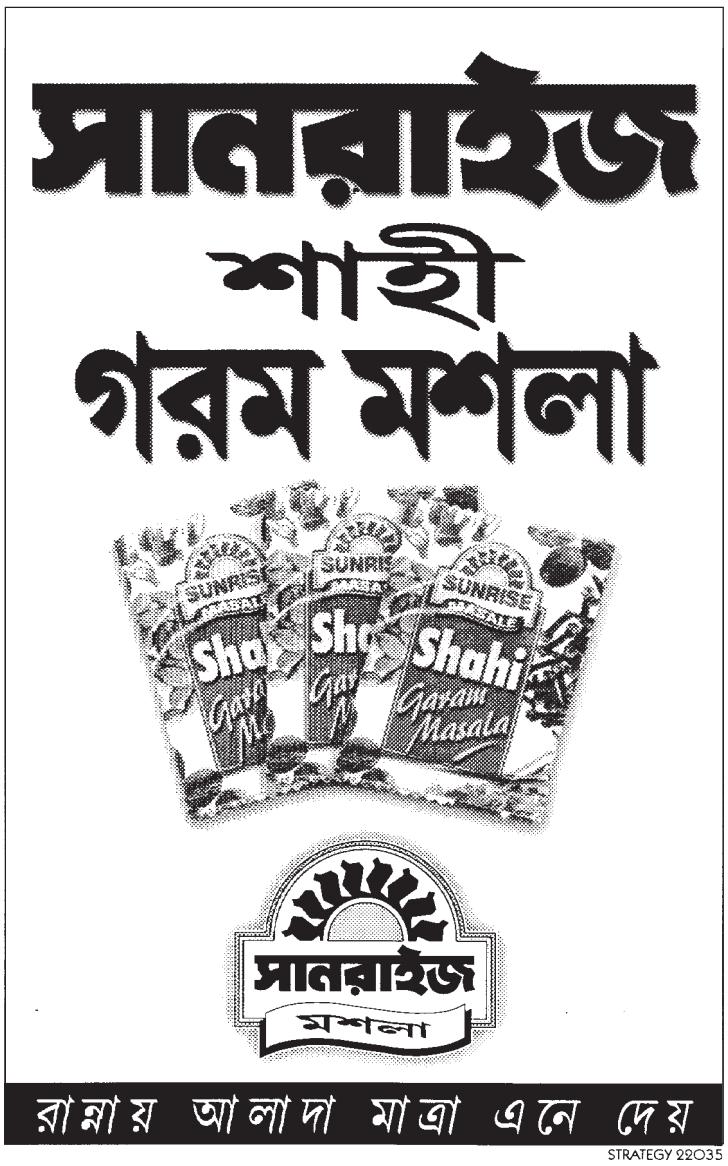

হুজি জঙ্গির প্রতি ত্রিপুরার সি পি এম সরকারের দরদ

সংবাদদাতা ।। বামপন্থীদের মুসলমান জঙ্গিদের প্রতি দরদ আরও একবার প্রমাণিত হল। কট্টর হুজি জঙ্গি মামুন মিঞা মাত্র তিরিশ হাজার টাকার জামিনে মুক্ত হল গত ১৭ আগস্ট। চার্জশিট না দেওয়ায় মামুন-এর মুক্তি সম্ভব হল। আগরতলায় সিপিএম-এর মন্ত্রী সাহিদ চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ, পারিবারিক আত্মীয়সম হুজি জঙ্গি মামুন মিঞাকে গ্রেপ্তার করেছিল কলকাতা পুলিশ। কিন্তু আর এক বাম রাজত্ব ত্রিপুরা-র পুলিশের গাফিলতিতেই মামুন জামিন পেয়েছে বলে ওয়াকিবহাল মহল মনে করেছে। মামুনের জামিনের জন্য মামুনের পক্ষে আইনজীবীরা আদালতের কাছে আবেদন জানায়। সার্বিক দিক বিচার করে আদালত ত্রিশ হাজার টাকার বেলের বণ্ডে তাকে জামিনের নির্দেশ দেন। মামুন কাণ্ডের তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকের গাফিলতিতেই মামুন জামিন পায়। গত ২৮ মার্চ রাজধানীর রামনগর এলাকা থেকে হুজি'র সক্রিয় সদস্য মামুনকে পশ্চিমবঙ্গের গোয়েন্দা শাখার পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তার বিরুদ্ধে বেআইনীভাবে রাজ্যে প্রবেশ, জাল পাসপোর্ট, অস্ত্রকারবারের সাথে যুক্ত এবং রাজ্যে জাল টাকা ছড়িয়ে দেওয়ার সাথে যুক্ত থাকার অভিযোগ ছিল। পাশাপাশি সন্ত্রাসবাদী জঙ্গি গোষ্ঠীর সদস্য মামুনের সঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী সাহিদ চৌধুরীর সখ্যতার বিষয়টিও ছিল।

গত ১৬ এপ্রিল মামুনের বিরুদ্ধে পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত ইনচার্জ স্বতঃপ্রণোদিত মামলা নথিভুক্ত করেন। মামলা অনুযায়ী ষাট দিনের মধ্যেই চার্জশীট আদালতে পেশ করার কথা। কিন্তু রবিবার ষাটদিন পূর্ণ হওয়ার পরও আদালতে তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকের কোনও চার্জশীট জমা পড়েনি। ফলে মামুনের পক্ষের আইনজীবীরা আদালতের কাছে মামুনের জামিনের জন্য আবেদন করেন। সরকার পক্ষের আইনজীবী জামিনের আবেদনের বিপক্ষে সওয়াল করেন। কিন্তু কোনও ধরনের চার্জশীট না থাকায় আদালত জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে।

আদালতে হুজি সদস্য মামুন মিঞা-কে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

জঙ্গি সংগঠন হুজি'র সদস্য মামুন মিঞার জামিনে ছাড়া পাওয়ার বিষয়ে তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকের গাফিলতি ও ব্যর্থতাকেই দায়ি করেছে বিরোধীরা। বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে দফায় দফায় মামুন মিঞাকে পুলিশ ও তদন্তকারী আধিকারিকের তরফে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলেও কেন যথাসময়ে চার্জশীট জমা পড়ল না — এনিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

ভারতীয় দণ্ড বিধির ৪৬৮, ৪৭১, ৪২০, ১২০ (বি), ১২১ (এ), ১২৪ এবং বৈদেশিক আইন-এর ১৪ নং ধারায় মামুনকে আটক করা হয় রাজধানীর রামনগর এলাকার এক ভাড়াবাড়ি থেকে। রামনগর থাকাকালীন সময়ে কিভাবে, কোন ধরনের উপার্জিত অর্থে বিলাসবহুল জীবনযাত্রা করত, কোন্ কোন্ ইসলামি জঙ্গি গোষ্ঠীর সাথে তার যোগাযোগ রয়েছে, রাজ্যে জাল নোট ছড়ানো ও কাগজপত্র কিভাবে করছে ইত্যাদি নানা প্রশ্ন ওঠে। এমনকি কুখ্যাত মামুন মিঞার সাথে মন্ত্রী সাহিদ চৌধুরীর সখ্যতার বিষয়টি নিয়েও রাজনৈতিক মহলে ঝড় বয়ে যায়। মন্ত্রিত্ব থেকে অপসারিত করা হয় মন্ত্রী সাহিদ চৌধুরীকে। প্রথমতঃ আদালত তাকে এস বি সেলে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করার নির্দেশ দেয়। দু'দুবার তাকে পশ্চিমবঙ্গেও নিয়ে যাওয়া হয় বিভিন্ন মামলার তদন্তে। মামুন কাণ্ডের তদন্তের ভার শেষ পর্যন্ত সি আই ডি-র হাতে বর্তায়। গত ২৪ জুলাই মামুনকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনার জন্য নির্দেশ দেয় আদালত। সেই অনুযায়ী ৬ আগস্ট তাকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনা হয় কড়া নিরাপত্তার মধ্যে। পরে আদালতে আনা হলে আদালত ১৪ দিনের জেল হাজতে পাঠায়। পাশাপাশি তার যে সকল মামলাগুলির তদন্ত বাকি ছিল তা তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে সমস্ত তদন্ত কাজ শেষ হওয়ার পরও কোনও চার্জশিট নির্দিষ্ট দিনে আদালতে জমা পড়েনি। সেই পুলিশী গাফিলতির সুযোগেই ছাড়া পেয়ে যায় মামুন।

একসময় দিনের পর দিন রামনগর এলাকায় মামুন বেনামে বসবাস করলেও রাজ্য পুলিশ তা ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি। রাজ্য গোয়েন্দা শাখাও সে ব্যাপারে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। পশ্চিমবঙ্গের গোয়েন্দা শাখার পুলিশ তাকে আটক করে। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে এক সময় হুজি সদস্য মামুন রাজ্যে নানা ধরনের কার্যকলাপ চালায়। এখনও তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকের ব্যর্থতাকে পুঁজি করেই জামিনে ছাড়া পেয়ে যায় মামুন।

এদিকে ভট্টপুকুরের বিশ্বজিৎ বণিকের হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত সমাজদ্রোহী শ্যামল দাসের চার্জশীট সুনির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়ার আগেই আদালতে জমা পড়েছে। সেইদিকে বিচার করলে কুখ্যাত জঙ্গি সদস্য মামুনের চার্জশিট সুনির্দিষ্ট সময়ে জমা না পড়ার পেছনে রাজনৈতিক মহলের চাপ ও অঙ্গুলি হেলনই কাজ করেছে কিনা এনিয়েও প্রশ্ন উঠেছে কোনও কোনও মহলে। সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনায় ছিলেন আইনজীবী ব্রজরঞ্জন দাস রায়। মামুনের পক্ষে মামলা পরিচালনায় ছিলেন আইনজীবী শংকর লোধ, সুরঞ্জন চৌধুরী, আবুল হাসেম, দেবালয় ভট্টাচার্য।

অসমে উলফা দমনে সেনার সাফল্য

সংবাদদাতা ।। অসমের ডিব্রুগড় আর তিনসুকিয়া উলফা-র গড় বলেই পরিচিত। সম্প্রতি সেখানেও সেনাবাহিনীর মাউন্টেন ডিভিশন বেশ ভালোরকম সাফল্য লাভ করেছে। কুড়ি মিনিটের এক রুদ্ধশ্বাস এনকাউন্টারে সেনাদের হাতে স্বঘোষিত উলফা কমান্ডার সার্জেন্ট বাবা দহেরা এবং কর্ণেল কৃষ্ণমণি গগৈ ওরফে রাজীব বাকলিয়ান মারা পড়েছে। দুটি একে ৪৭ স্বয়ংক্রিয় রাইফেল ও ম্যাগাজিন সেনারা বাজেয়াপ্ত করেছে। উলফা-র এই দলটির আর এক সদস্য হল মধুর্য গোহাঞি ওরফে লাকি নিয়োগ। এরাই দীর্ঘদিন ধরে হিন্দীভাষী শ্রমিকদের হত্যা সহ অনেক নাশকতামূলক কাজে যুক্ত ছিল। পাঁচজন পুলিশকেও এরা হত্যা করেছে। এছাড়া এই দলটিই ডিব্রুগড় ও তিনসুকিয়াতে ব্যাপক পরিমাণে টাকা আদায় করেছিল। তিনসুকিয়া জেলার টেঙ্গখাট এলাকার বড়ভান গ্রামে উলফা ক্যাডাররা ডেরা গেড়েছে বলে খবর পেয়ে সেনারা সন্ধ্যের আগেই নির্দিষ্ট বাড়িটিকে ঘিরে ফেলে, এরপর গুলির লড়াইয়ে দুজন জঙ্গি মারা পড়লেও অন্যরা পালিয়ে যায়।

উদ্ধার হওয়া অন্যান্য জিনিসপত্রের মধ্যে রয়েছে সিমকার্ড, রিচার্জ কুপন সহ তিনটি মোবাইল, অনেক নথিপত্র। শিবসাগর জেলায় অন্য একটি অভিযানে সেনাবাহিনী উলফা-র বিস্ফোরক (আই ই ডি) বিশেষজ্ঞ আদিত্য নাইডু ওরফে তরুণ পাণ্ডবকে কাকোতিবাড়ি থানার তিমনটিংলাইন গ্রামে এনকাউন্টারে খতম করতে পেরেছে বলে জানা গেছে। সম্ভবত, ওই দু-তিনটি অভিযানই উলফার মধ্যেকার ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী গোষ্ঠীটির কোমর ভেঙে দেয়। তার ফলেই তারা শীর্ষ নেতৃত্বের মতামত ছাড়াই আলোচনার টেবিলে বসতে আগ্রহ প্রকাশ করে মৃণাল হাজারিকার নেতৃত্বে। প্রকাশ্যে আসে। আর এসব কারণেই উলফা'র শক্তি হ্রাস ও শীর্ষ নেতৃত্বের বিদেশে বসে রাজার হালে জীবনযাপনের গোপন খবর তাদেরই ক্যাডারদের মুখে মুখে ছড়াতে শুরু করে বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা।

লেখকদের প্রতি

যে কোনওরকম লেখা, সে চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন তা কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন রেখে না হলে কোনও মতেই ছাপার জন্য বিবেচিত হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না। কোনও লেখারই ফটো কপি গ্রাহ্য হবে না। চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের ওপর "চিঠিপত্র" কথাটি অবশ্যই লিখবেন। এতে খুব তাড়াতাড়ি চিঠিটি একেবারে চিঠিপত্র বিভাগে গিয়ে পৌঁছায়।

চিঠিপত্র বা সংবাদ সামগ্রী যাই পাঠানো হোক না কেন তাতে প্রেরকের পুরো নাম-ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার (যদি থাকে) থাকা দরকার। না থাকলে তা ছাপা হবে না।

— সঃ স্বঃ

গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টেপ্রকাশ

অনুপ্রবেশে ইচ্ছুক প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা দেয় ঢাকা

সমীপকুমার দাস, করিমগঞ্জ ।। বিনা পাসপোর্টে ভারত-ভূখন্ডে প্রবেশ এবং তারপর ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণ, এই দু'টো কাজ করতে যেসব বাংলাদেশি নাগরিক ইচ্ছুক তাদের মাথাপিছু কুড়ি হাজার করে টাকা সহায়তা অনুদান দিচ্ছে বাংলাদেশ সরকার — অভিযোগ নয়াদিল্লীর। কেন্দ্রীয় গুপ্তচর দফতরের উচ্চস্তরীয় একটি রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগের স্থানীয় একটি সূত্র জানিয়েছে — বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত দু'দেশের সীমান্ত রক্ষীদের সাম্প্রতিক আলোচনায় বিষয়টি উত্থাপন করেছে বিএসএফ। ওই আলোচনায় সীমান্ত-সন্ত্রাস, চোরাচালান, ডাকাতি, গবাদি পশু চুরি সংক্রান্ত নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়েছে। বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলের পাঁচপীর এলাকায় বিএসএফের গুলিতে সে দেশের বিডিআরের দুই জওয়ান মারা যাওয়ার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ওই আলোচনার আয়োজন করা হয়েছিল। তখনই কুড়ি হাজার টাকার বিনিময়ে অনুপ্রবেশে উৎসাহ জোগাচ্ছে বাংলাদেশ, এই অভিযোগ তোলে ভারত।

ভারতের সীমান্তরক্ষীদের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তোলা একগুচ্ছ অভিযোগকে কেন্দ্র করে নাকি সেই আলোচনা সভা বেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠেছিল। বিডিআর-এর জওয়ানদের কেন হত্যা করা হল, বাংলাদেশের অফিসারদের এই প্রশ্নের জবাবে ভারতীয় সীমান্ত বাহিনীর অফিসাররা পাল্টা প্রশ্ন তোলেন। তাঁদের কাছে জানতে চান, পাঁচপীর অঞ্চলে গরু পাচারে বাধা দিতে কোন্ অভিসন্ধিতে আগে থেকে ভারতের বিএসএফ ক্যাম্পে গুলি করেছিল বিডিআর? বি এস এফের পাল্টা প্রশ্নের কোনও সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেনি বিডিআর! সূত্রটি আরও জানিয়েছে, বাংলাদেশে বহু জঙ্গি শিবিরের অস্তিত্ব, ব্যাপক ভারত বিদ্বেষী প্রচার এবং ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বেশ কিছু বিরোধ নিয়ে আলোচনা হয় সেদিনের সভায়। বাংলাদেশের মাটিতে ভারতীয় জঙ্গি শিবির এবং তাদের প্রতি ঢাকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতের ব্যাপারটিকে নিয়েও বেশ কথা কাটাকাটি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

বাংলাদেশের মতো দরিদ্র একটি রাষ্ট্র ব্যাপক জনবিস্ফোরণের হাত থেকে রেহাই পেতে বাংলাদেশ সরকার তাদের দেশের নাগরিকদের সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করতে প্ররোচনা জোগাত বলে বহু পুরনো একটি অভিযোগ ছিল। ওই অভিযোগ এখন আরও পোক্ত হয়েছে। গোয়েন্দাদের সর্বশেষ তথ্য বলছে, বাংলাদেশ সরকার নাকি এখন ভারতে অবৈধ ভাবে অনুপ্রবেশকারিদের নগদ কুড়ি হাজার টাকার আর্থিক অনুদান প্রদান করার মতো একটি বিশেষ ব্যবস্থা চালু করেছে। এবং এই প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছে জামাত-ই-ইসলামি মদতপুষ্ট বেগম জিয়ার আমলে। এ বিষয়টিও সেদিনের আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে উঠে এসেছিল।

কেবল এ-ই নয়, ভারত-বাংলা বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় গবাদি পশু সহ অন্যান্য সামগ্রীর চোরাচালান প্রক্রিয়ারও খবর রয়েছে। চোরকারিবারিদের হাত দিয়ে এপারের মাল ওপারে যায়; ওপারের মাল এপারে আসে। খবর, বাংলাদেশের কোনও চোরাই সামগ্রী ভারতে আসলে তা থেকে ভারত সরকারের এক পয়সা আয় হয় না। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার ওই চোরাকারবারিদের কাছ থেকে সামগ্রী অনুযায়ী বিভিন্ন অঙ্কের রাজস্ব পায়। সে দেশের সরকার তা আদায় করে নেয়। ওই রাজস্বের অঙ্কের হিসেবে গত জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত এদের কাছ থেকে বাংলাদেশ আয় করেছে ১,৯০,০০,০৪৮ টাকা, অর্থাৎ প্রায় ২ কোটি টাকা।

গুপ্তচর সংস্থার স্থানীয় সূত্রটি আরও জানিয়েছে, বাংলাদেশ থেকে ফিরে এসে ভারতের অফিসাররা তাঁদের হেডকোয়ার্টারে যা রিপোর্ট করেছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দফতর থেকে কাছাড়-করিমগঞ্জ সহ ধুবড়ি, পার্শ্ববর্তী রাজ্য ত্রিপুরা, মেঘালয় এবং মিজোরামে নিয়োজিত সকল সীমান্ত চৌকিকে সতর্ক করে বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশের দিক থেকে বিপদ ঘনাচ্ছে। আমাদের (বিএসএফ) দুর্ভাবনা, সরাসরি যুদ্ধে না নামলেও বাংলাদেশ ভারতকে উত্তরোত্তর ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে।

অতএব, আমাদের সর্বতোভাবে সতর্ক থাকতে হবে...।'

মায়াবতী এখনও প্রধানমন্ত্রীত্বের খোয়াব দেখছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। গত ৯ আগস্টের জনসভায় মায়াবতীকে আগের থেকে আলাদা মেজাজে দেখা গেল। এতদিন বড় বড় জনসভায় বড়-বড় কথা বলা, নিজেকে জাহির করা উত্তরপ্রদেশের দলিত মুখ্যমন্ত্রী এবার অনেকটা রক্ষণাত্মক মেজাজে ছিলেন। অভিনয় কীনা তা বলা যাচ্ছে না, তবে কথাবার্তায় ভাবভঙ্গিতে ভয় যেন তার চোখে মুখে ফুটে উঠছিল। বহুজন সমাজ পার্টির জনসভায় ভীড় ভালোই ছিল। যতই লোকসভার নির্বাচনের দিন এগিয়ে আসছে উত্তরপ্রদেশের রাজ্য-রাজনীতির রং-রূপে দ্রুত বদল হচ্ছে। প্রকাশ কারাতরা সোনিয়া -মনমোহনকে টাইট দিতে মায়াবতীকে আগামীদিনের দলিত প্রধানমন্ত্রী রূপে ঘোষণা করে সুবিধা করতে পারেননি। আস্থাভোটে ইউ পি এ-কে পরাজিত না করতে পেরে মায়াবতীর প্রধানমন্ত্রীত্বের বেলুন চুপসে যায়। এরপর মায়াবতী সপা-উপা (এস পি - ইউ পি এ) জোটকে ভয় পেতে শুরু করেন। তাঁর বিরুদ্ধে তাজ-করিডর সহ অনেক মামলা শুরু হতে পারে। ওই জনসভায় মায়া বলেন, "বিজেপি এবং কংগ্রেস আমাকে জেলে পাঠাতে চায়, আমাকে হত্যা করতে চায়। লোকসভা ভোটের আগে অথবা অব্যবহিত পরে এটা হতে পারে। এজন্য আমি আমার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছি। সে জাতিতে চামার এবং আমার চেয়ে ১৮/২০ বছর বয়সে ছোট। জনসভায় মায়াবতী নাম বলেননি। তার নাম বসপা'র দলের লেটারহেডে লিখে যোগ্যস্থানে পাঠিয়ে

মায়াবতী

রাজা রাম। মায়াবতীর উত্তরাধিকারী ?

দিয়েছেন বলে জানিয়ে দেন।

ওই সমাবেশে প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী নটবর সিং বি এস পি দলে যোগ দেন। প্রসঙ্গত, তেল-ঘুষ-কেলেঙ্কারিতে নটবর ও তার পুত্র জড়িয়ে যাবার পর নটবরকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। অনেক দলের দরজায় দরজায় ঘোরাঘুরি করে নটবর কোথাও ঢোকার সুযোগ পাননি। লক্ষ্ণৌতে জোর আলোচনা চলছে নটবর আগামী লোকসভা নির্বাচনে রাজস্থানের ভরতপুর লোকসভা কেন্দ্রে বি এস পি দলের টিকিটে প্রার্থী হবেন। নটবরকে দিয়ে মায়াবতী হরিয়ানা, রাজস্থান এবং পশ্চিম-উত্তরপ্রদেশের জাঠ ভোট ব্যাঙ্ক নিজের দিকে টানতে চান বলে শোনা যাচ্ছে। ৮৫ মিনিটের লিখিত বক্তৃতায় মায়াবতী লালু-মুলায়ম থেকে শুরু করে ইন্দিরা-রাজীব-রাহুল গান্ধীর তীব্র সমালোচনা করেন। লালুর উদ্দেশ্যে মায়াবতী বলেন, 'লালু বলেছেন, মায়াবতী প্রধানমন্ত্রী হলে সর্বত্র দুর্গন্ধ ছড়াবে। অথচ দলিত আম্বেদকরের রচিত সংবিধানের বলেই লালুরা মুখ্যমন্ত্রী বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়েছেন। তা না হলে লালু হয়ত কোনও জমিদারের বাড়ির মোষ চরাতেন।' মায়ার মতে — ইন্দিরা থেকে রাজীব-রাহুলরা তো গরীবি হটাও-এর নাটকই করেছেন। কাজের কাজ করেননি। মায়াবতী একথাও বলতে ছাড়েননি যে, ২২ জুলাই তারিখেই তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী হতেন। কিন্তু কংগ্রেস-বিজেপির-সংযুক্ত ষড়যন্ত্রে তা সম্ভব হয়নি। তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী হলেও তিনি সন্ত্রাসবাদকে সমাপ্ত করবেন এবং আদিবাসী ও ভূমিহীনদের তিন একর করে সরকারি জমি দেবেন। এসব বক্তব্যই প্রমাণ করে মায়াবতী তার সমর্থকদের মনে তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্বের উজ্জ্বল সম্ভাবনার আলো জ্বালিয়ে রাখতে চান। বাস্তব হল, উত্তরপ্রদেশেও কৃষকরা ঋণের চাপে আত্মহত্যা করছে আর দলিতরা অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। আমেদাবাদে বিস্ফোরণে যুক্ত সিমির পান্ডারা ধরা পড়েছে যাদের অনেকেই উত্তরপ্রদেশের।

সংস্কৃত ভাষাকে জনমুখী করার উদ্যোগ নিচ্ছে খাণ্ডুরী সরকার

রাজ্যে রাজ্যে
রাজ্যে রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষার বিষয় বস্তুর সঙ্গে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সমন্বয়ে এক নতুন প্রয়াস শুরু করতে চলেছে উত্তরাখন্ডের খান্ডুরি সরকার। সরকারি সুত্র অনুসারে, প্রাচীন ভারতীয় ঋষি-মুনিদের যে বিস্তর গবেষণা রয়েছে তার পুরোটাই সংস্কৃত ভাষার মধ্যে আবদ্ধ। সেই তত্ত্বকে আধুনিককালের উপযোগী করে প্রকাশের জন্যই সরকার রাজ্যে ছয়টি সংস্কৃত বিদ্যালয় গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং পরবর্তীকালে বিষয়গুলির চর্চার মাধ্যমে যাতে তত্ত্ব উদঘাটিত হয় তার সবরকম প্রচেষ্টা চালানো হবে।

হিমালয়ের কোলে অবস্থিত উত্তরাখণ্ড দীর্ঘকাল ধরে ভারতবাসীর আকর্ষণের কেন্দ্র। গড়ে উঠেছে একাধিক তীর্থক্ষেত্রও। পর্বতের গভীর জঙ্গলে মুনি-ঋষিরা নীরবে সাধন মনন করেছেন। আজও তাদের উপদেশাবলী পাহাড়ী জনজাতিদের মুখে মুখে প্রচলিত। অন্যদিকে প্রাচীন পুঁথিপত্রেও তাদের চিন্তা-ভাবনা গবেষণার দিকগুলি ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সেই চিন্তা-ভাবনার তত্ত্বগুলো আজ আরও প্রাসঙ্গিক হলেও সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে তৎকালীন ভাষায়। বিষয়বস্তু খুঁজে পাওয়া গেলেও তার থেকে ভাব সংগ্রহের প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ভাষার অজ্ঞতা। সেই অজ্ঞতা দূর করার জন্যই খান্ডুরি সরকারের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত রাজ্য জুড়ে ছয়টি সংস্কৃত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং এই ভাষার প্রচলন করা। রাজ্যের প্রচার সঞ্চালক তথা পরামর্শ কমিটির চেয়ারম্যান ডঃ দেবেন্দ্র ভাসিনের বক্তব্য অনুযায়ী, সঠিকভাবে সংস্কৃত চর্চা করে যদি

খাণ্ডুরী

প্রাচীন পান্ডুলিপি নিয়ে নতুন করে গবেষণা শুরু করা যায়, তাহলে ভেষজ ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে যেতে পারে। কেননা পর্বতের বিভিন্ন স্তরে যে অসংখ্য গাছ-গাছড়া রয়েছে যেগুলির মধ্যে অনেক ঔষধি গুণ সম্পন্ন গাছও রয়েছে। তার উল্লেখ এবং ব্যবহার সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে। প্রকৃতি, খনিজ সম্পদ সম্পর্কেও অনেক অজানা তত্ত্ব বেরিয়ে আসতে পারে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

রাজ্যের সংস্কৃত শিক্ষা উপনির্দেশক ডঃ বাচস্পতি মৈঠানীর মতে, এই সম্পূর্ণ উদ্যোগটি দুটি ভাগে সম্পন্ন করা হবে। প্রথম ভাগে নতুন বিদ্যালয় চালুর পাশাপাশি পুরনো বিদ্যালয়গুলিকে সংস্কার করা হবে এবং দ্বিতীয় ভাগে ১৬৫ জন শিক্ষক নিয়োগের যাবতীয় ব্যবস্থা পাকা করা হবে। প্রাথমিক ভাবে এই দুটি কাজ হবার পর, দ্বিতীয় ভাগে মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ভাষা নিয়ে গবেষণা এবং পুরনো পুঁথিপত্র ঘেটে অজানা তত্ত্বের উদ্ধারকাজ শুরু করা হবে। এই কাজে সরকারি উদ্যোগ ছাড়াও সংস্কৃত ভাষা চর্চার সর্বভারতীয় সংস্থা সংস্কৃত ভারতী-র সঙ্গে যৌথভাবে আরও বড় কিছু করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে তিনি কথা প্রসঙ্গে জানান। প্রাথমিক মেরামতি ও গঠনমূলক কাজের জন্য বিদ্যালয় প্রতি ১৫ লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ করা হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানা গেছে। এই সমস্ত পরিকল্পনা রাজ্যে সাম্প্রতিক পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য চালু হওয়া আচার সংহিতা উঠে যাবার পরই জরুরী-কালীন ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হবে বলে জানা গেছে।

সমুদ্রের আগ্রাসনে প্রমাদ গুণছে কানহুপুরের মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। ২০০৪ সালের সেই দৃশ্যটা এখনও ভুলতে পারেনি ভুবেনশ্বরের কানহুপুর গ্রামের সনাতন দাস। সমুদ্রের ঢেউয়ে সেদিন শেষ সম্বলটুকুও তাকে হারাতে হয়। শুধু সনাতন দাসেরই ঘর-বাড়ি হারানোর ঘটনা ঘটছে এমন নয়। সমুদ্র উপকূলবর্তী কানহুপুর, সাতভায়া গ্রামের বাসিন্দাদের কাছে সমুদ্রের ঢেউয়ে নিঃস্ব হয়ে যাওয়া নতুন নয়। এ যেন তাদের কছে ভবিতব্য। প্রতিবছরই তাদের সুখ দুঃখের সংসার সমুদ্রে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

উইলার দ্বীপ থেকে বারুণী নদীর মোহনা পর্যন্ত সমুদ্র ৫০ কিমি চওড়া বেলাভূমি প্রতিনিয়ত ক্ষয় করে চলেছে। কানহুপুর ও সাতভায়া গ্রামের মানুষের বিপদ এখানেই। বিশেষজ্ঞদের মতে সমুদ্র ৩০০ মিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগামী ৫ বছরে তা আরও বৃদ্ধি পাবে বলেও তাদের ধারণা। তাই কানহুপুর ও সাতভায়া গ্রামের বাসিন্দাদের বিপদ থেকে মুক্তি নেই। তারা সমুদ্রের করাল থাবা থেকে বাঁচতে অন্যত্র সরে গেলেও তা যথেষ্ট নয়। সনাতন দাসেদের মতে, সরকারই তাদের একমাত্র ভরসা। তাদের মতে উঁচু জায়গা দেখে ঘর তৈরি করে থাকার মতো সামর্থ্য সবার মধ্যে নেই। সাময়িক ভাবে অন্যত্র সরে গেলেও আবার সেই বিপদের সঙ্গেই তাদের বসবাস করতে হচ্ছে। ১৯৯২ সালে তাদের বাগাপতি গ্রামে পুনর্বাসনের ভাবনা চিন্তা করা হলেও সেই অঞ্চলের বনদপ্তর বনভূমির কথা মাথায় রেখে তা বাতিল করে দেয়। তবে এই ঘটনায় সরকার হাত-পা গুটিয়ে বসে নেই। ২০০৪ সালে সরকার ওই গ্রামের বাসিন্দাদের নিয়ে

নাগরাকান্ডে নতুন কলোনি গড়ার চেষ্টা করলেও উক্ত অঞ্চলটির ভিতরকণিকা অভয়ারণ্য থাকার ফলে তা সম্ভব হয়নি।

সম্প্রতি সরকার ১৪৩ কোটি টাকা সমুদ্রের ক্ষয় প্রতিরোধে জাতীয় উপকূল নিরাপত্তা প্রকল্প খাতে বরাদ্দ করেছে। তবে কানহুপুর ও সাতভায়ার বাসিন্দাদের যে সমুদ্রের আগ্রাসন থেকে মুক্তি নেই একথা স্থানীয় মানুষের পাশাপাশি বিশেষজ্ঞদেরও ধারণা।

ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়,
রোদ বৃষ্টিতে কিসের ভয় !
অক্ষয় কুমারপালের ফোল্ডিং ছাতা
বড়বাজার,কলকাতা-৭০০ ০০৭,
ফোন ঃ ২২৪২৪১০৩

বুড়ো অমরনাথ যাত্রা বন্ধ করে প্রশাসন মুখ ঢাকল

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। প্রশাসনিক দুর্বলতাকে ঢাকা দিতে বুড়ো অমরনাথ যাত্রা বাতিল করে দেয় পিডিপি-কংগ্রেস জোট সরকার। পুঞ্চ জেলায় বুড়ো অমরনাথ জম্মুর আর একটি পবিত্র তীর্থস্থান। প্রতিবছরই অসংখ্য হিন্দু তীর্থ যাত্রী বুড়ো অমরনাথের দর্শন করতে আসেন। আগস্টের ৩ তারিখ থেকে এই যাত্রা শুরু হয়। পুরো শ্রাবণ মাস জুড়েই এই যাত্রা চলতে থাকে। বিগত চার বছর ধরে বজরঙ দলের নেতৃত্বে এই যাত্রা পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু চলতি বছরে সরকার নিজেদের প্রশাসনিক দুর্বলতাকে ঢাকতে যাত্রা বাতিলের নির্দেশ দেয়।

বজরঙ দলের মুখপাত্র প্রকাশ শর্মা

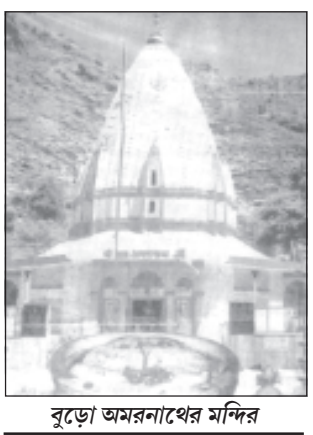

বুড়ো অমরনাথের মন্দির

জানিয়েছেন যে, '৫০০ জন তীর্থযাত্রীকে স্টেশন থেকেই স্থানীয় প্রশাসন ফিরিয়ে দিয়েছে।' শুধু তাই নয়, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা ও স্বাধবী ঋতম্ভরা দেবীকেও জম্মু এয়ারপোর্ট থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এখানেই শেষ নয়, স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গেও তাদের দেখা করতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সরকারের এই হিন্দু বিরোধী মানসিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েই ক্ষান্ত হয়নি।

তারা ২০ টি রাজ্য থেকে ২০ হাজার যুবককে একত্রিত করে বুড়ো অমরনাথের দর্শনে যাত্রা করে। প্রশাসনও এই ঘটনায় বেশ অস্বস্তিতে পড়ে। বুড়ো অমরনাথ দর্শনের যাত্রহা বাতিল করে ইউপিএ সরকার আবারও একবার তার হিন্দু বিরোধী মানসিকতারই পরিচয় দিল বলেই মনে করছে হিন্দুরা।

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
15, College Street, Kolkata-700012 Ph : 2241-7149 / 8174

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

হলদিয়া বন্দরের জনক সতীশচন্দ্র সামন্ত

বিশেষ সংবাদদাতা ।। ১৮৭০ সালে বৃটিশদের হাতে গড়া বন্দর কলকাতা। নদীমাতৃক বন্দর। সমুদ্রের মোহনা থেকে যার দূরত্ব ১২৬ মাইল। ওই বছরের সদ্য চালু হওয়া কলকাতা বন্দর থেকে মাল ওঠানো

নামানো হয়েছিল ৩.২৭ মিলিয়ন টন। ভাগীরথীর বুকে গড়ে ওঠা এই বন্দরের সঙ্গে তৎকালীন বাংলার লেফটেন্যান্ট গর্ভনরসহ বৃটিশ কর্তারা ইউরোপ এবং এশিয়ার বন্দরের তুলনা করে বলেন, সর্বকালের সেরা বন্দর। এরপর নদীর বুক দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। খিদিরপুর, বজবজ-এ একের পর এক জেটি তৈরি হয়েছে বন্দর সম্প্রসারণের নামে। বর্তমানে নদীর নাব্যতা একটা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে কলকাতা বন্দরকে। নদীর নাব্যতা কমতে থাকায় পঞ্চ াশের দশকেই কলকাতা বন্দরকে বাঁচাতে শুরু হয় তৎপরতা। অনুসন্ধান চলে নদীর গভীরতার। কারণ বড় জাহাজের ক্ষেত্রে ততদিনে খিদিরপুর ডক বা নেতাজী সুভাষ ডক অচল হয়ে পড়ছে।

ষাটের দশকের গোড়ায় বিশেষজ্ঞরা হলদি নদীর তীরে সুতাহাটা গ্রামটি শনাক্ত করেন আজকের হলদিয়া বন্দরের জন্য। আর এ কাজে যিনি বিশেষ উদ্যোগী হয়ে বিশেষজ্ঞদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি হলদিয়ার প্রাণপুরুষ সতীশচন্দ্র সামন্ত। সতীশচন্দ্র ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছাত্র থাকাকালীন ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে কারাবরণ করেছিলেন। পরে সংসদ সদস্য হিসেবে সেই সময়ের ভারত সরকারের জাহাজ পরিবহন দপ্তরের মন্ত্রী রাজবাহাদুরের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। ওই সময়েই হলদিয়ায় একটি বন্দর স্থাপনের কথা তিনি মন্ত্রীকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। যদিও আমলারা বলেছিলেন, “এটা অসম্পূর্ণ অবাস্তব।” এ প্রসঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামী সুশীল কুমার ধাড়া তাঁর ‘হলদিয়া বন্দরের প্রারম্ভ, বিকাশ এবং ভবিষ্যৎ’ বিষয়ক এক স্মৃতি কথায় লিখছেন — “সতীশবাবুর কথামতো মন্ত্রী সরজমিনে দেখবার (পরিদর্শনে নয়) সিদ্ধান্ত নিলেন। ঘটনাক্রমে ঐ সময়ে সুতাহাটা ও মহিষাদল বিধানসভার সদস্যরূপে মহাতাপচাঁদ দাস ও আমার উপর সবরকম ব্যবস্থার ভার দিলেন। আমরা আমাদের সাধ্যমতো করলাম নেতার ইচ্ছাকে রূপ দেওয়ার জন্য। মাঠে তখন শীতের ফসল খেসারি কলাই — বিরাট মণ্ডপ করতে এসব নষ্ট করতে হল। প্রচুর লোকসমাগম হল। রাজ্যমন্ত্রীরাও বেশ কয়েকজন এলেন। গেঁওখালী থেকে পরিদর্শন (সার্ভে) শুরু করে বর্তমান হলদিয়ার অয়েল জেটি পর্যন্ত কারিগরি পরিদর্শনের পর এবং অনেক ভাবনা চিন্তার পর কেন্দ্রীয় সরকার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন যে, একটি আনলোডিং জেটি করতে হবে। যেখানের নাম দেওয়া হয়েছে ‘সতীশ সামন্ত অয়েল জেটি’। বন্দর না হয়ে জেটি কেন হল? এর ব্যাখ্যা জাহাজমন্ত্রীর দপ্তর যা দিয়েছিল তা এরূপ — ভারতবর্ষে কোথাও কারও নামানুসারে বন্দর করার রেওয়াজ নেই — তাই জেটি মেনে নিতে হল। অবশ্য সে সময় আন্দোলনও হয়েছিল।

Design's For Modern Living

Neycer

NATIONAL PIPE & SANITARY STORES

Sales Office : 15, College Street, Kolkata-700012

Ph : 2241-7149 / 8174, 2237-1521

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831 / 33

নেত্রদান মহাদান

EYE BANK

23218327, 23592931, 22413853

Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

হলদিয়া বন্দর কি বিলুপ্তি

নবকুমার ভট্টাচার্য

১০৪ কিলোমিটারের দূরত্ব ঘুচিয়ে কলকাতাকে বাঁচাতেই একদিন হাত বাড়িয়ে দিয়েছে হলদিয়া। কলকাতা বন্দরকে বাঁচাতেই জন্ম হয়েছে হলদিয়া বন্দরের। আত্মপ্রকাশের মুহূর্ত থেকেই হলদিয়া বন্দর নিবিষ্ট সেই কাজে। নাব্যতা ক্রমশ কমে আসা কলকাতা বন্দরের প্রাণশক্তি সে ফিরিয়ে দিচ্ছে অন্যপ্রান্ত থেকে। তাই কলকাতা হলদিয়া বন্দরকে তুলনা করে চলে পিতা-পুত্রের সঙ্গে।

১৯৪৭ সালে কলকাতা বন্দর ছিল ভারতের বড় বড় বন্দরগুলির অন্যতম। কেন্দ্রীয় ভূতল পরিবহন মন্ত্রকের হিসেবে সারা দেশের সমস্ত বন্দরগুলির মধ্যে ওই বছর পণ্য ওঠানো নামানো হয়েছিল ষোলো মিলিয়ন টন। এরমধ্যে কলকাতা বন্দরেই হয়েছিল সাড়ে সাত মিলিয়ন টন। মুম্বাই বন্দরে হয়েছিল পাঁচ মিলিয়ন টন আর মাদ্রাজে তিন মিলিয়ন টন। কিন্তু নদীর নাব্যতা কমতে থাকায় পঞ্চ াশের দশকেই কলকাতা বন্দরকে বাঁচাতে শুরু হয় তৎপরতা। অনুসন্ধান চলে নদীর গভীরতার। যেখানে সমান্তরাল ভাবে অন্য একটা বন্দর চালু করা যায়। কারণ একটাই — বড় জাহাজের ক্ষেত্রে খিদিরপুর ডক এবং নেতাজী সুভাষ ডক অচল হয়ে পড়ে।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালেই এই ভাবনার উৎপত্তি। বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে তিনি ভাবলেন — জাহাজের কিছু মাল বঙ্গোপসাগরের মুখেই কোথাও নামিয়ে দিলে অপেক্ষাকৃত কম ভারী জাহাজ কলকাতা পৌঁছুতে পারবে। এই ভাবনা থেকেই গঙ্গার নিম্ন অংশের কোনও স্থানের সন্ধান চলতে থাকে। ডাঃ রায় সমস্যা উপলব্ধি করলেও সমাধানের পথ তিনিও বের করতে পারেননি। এভাবে বেশ কয়েক বছর কাটার পর অবিভক্ত তমলুক মহকুমার তৎকালীন সাংসদ

> “কেন্দ্রীয় জাহাজ দপ্তর স্বীকার করছে হলদিয়ায় ২৩/২৪ টনের বেশি ওজনের জাহাজ আর ঢুকতে পারে না। অথচ এখন বিশ্বের দরিয়ায় এক লাখ টনের জাহাজের চলাচলই বেশি। ফলে বড় জাহাজ হলদিয়ায় ঢুকতে না পারার জন্যে ব্যবসা মার খাচ্ছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং শিল্পমন্ত্রী রাজ্যের উন্নয়ণ নিয়ে বড়বড় গালভরা বুলি আওড়ালেও হলদিয়া বন্দরের এই সংকটজনক পরিস্থিতিতেও সিটু মাঝেমাঝেই আন্দোলনের হুমকি দিচ্ছে। এতে সংকট আরও ঘনীভূত হয়েছে।”

সতীশচন্দ্র সামন্ত সমস্যার সমাধানে ব্রতী হলেন। সংসদ পাঠাগারে রক্ষিত “চ্জন্ব্ধন্দড় ড্রপ্রন্ত্রজব্ধ ট্রপ্সপ্পপ্পন্ব্ধব্ধন্দ্বন্দ্ব ত্মন্দ্বন্মপ্সজ্জব্ধ” তাঁর হাতে পড়ল। সেটা মন দিয়ে পড়তে পড়তে উপলব্ধি করলেন, এই কঠিন সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। তৎকালীন ভারত সরকারের জাহাজ ও পরিবহন দপ্তরের মন্ত্রী রাজবাহাদুরের প্রচেষ্টায় এবং সতীশচন্দ্র সামন্তের উদ্যোগে সমস্যার সমাধান হল। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর কেন্দ্রীয় সরকার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন যে — একটি আনলোডিং জেটি করতে হবে।

১৯৫১ সালের ২৯ ডিসেম্বর এখান থেকে প্রথম যে জাহাজটি ধোঁয়া ছাড়ে তার নাম ‘প্রিন্স অব ওয়েস্ট মিনিস্টার।’ এভাবেই পঞ্চ াশের দশকের শেষ পর্বে বিশেষজ্ঞরা হলদি নদীর তীরে সুতাহাটা গ্রামটি শনাক্ত করেন আজকের হলদিয়া বন্দরের জন্য। সমুদ্রের মোহনা থেকে যার দূরত্ব মাত্র ৭৫ কিলোমিটার। সেইসময় রাজ্যের রাজনৈতিক জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ফলে জেরবার হয় পশ্চিমবঙ্গের শিল্পক্ষেত্র। যার প্রভাব বন্দরেও এসে পড়ে। এসবের মধ্যেও হলদিয়া বন্দরের নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলে।

১৯৭৭ সালে সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করে হলদিয়া বন্দর। ‘বিশ্ববিজয়’ নামে ভারতীয় জাহাজ কয়লা নিয়ে এখানে প্রথম নোঙর ফেলে। তখন এখানে কয়লা, তেল বোঝাই বড় বড় জাহাজের আনাগোনা হত। নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের অভাব ও নানা সমস্যার ভারে কলকাতা বন্দর নুব্জ হতে থাকে। শ্রীবৃদ্ধি ঘটে হলদিয়া বন্দরের। অবস্থা সামলে দিতে তিনটি অয়েল জেটি আর দশটি বার্থ চালু করতে হয়। কিন্তু আজ এই বন্দরকে কেন্দ্র করেই নানান সমস্যা মাথাচড়া দিয়ে উঠছে। বয়স এই বন্দরের মাত্র ৩২ বছর। একদিন কলকাতায় হুগলির নাব্যতার সমস্যা মেটাতে হলদিয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এখন দেখা যাচ্ছে, হলদিয়াও নাব্যতার সমস্যায় আক্রান্ত। এটা বলা প্রয়োজন কলকাতা বন্দরের মৃত্যুদশা দেখেও হলদিয়া নিয়ে কেউ সেভাবে উদ্যোগ নেননি। এরাজ্যে আরও একটি বন্দর গড়ে উঠছে কুলপিতে।

নদীর নাব্যতা ও কলকাতা বন্দরের সমস্যা

রমাপ্রসাদ দত্ত

ভারতের সবচেয়ে দীর্ঘ ও গুরুত্বপূর্ণ নদীর নাম গঙ্গা। প্রায় ২৫২৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এই নদীকে কেন্দ্র করেই ভারতের মোটামুটি এক তৃতীয়াংশ জনসংখ্যার বসতি। ধর্মীয় গুরুত্ব ছাড়াও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নদীর ভূমিকা অপরিসীম। কিন্তু এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে অনেক স্থানেই নদীর গতিপথ আজ রুদ্ধ এবং জলধারা ক্ষীণ।

এখন গঙ্গা বলতে আমরা বুঝি গোমুখ থেকে ফারাক্কা এবং ফারাক্কা থেকে পুরনো ভাগীরথী খাত যা কিনা বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে এবং আর একধারা পূর্বদিকে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে পদ্মা নাম নিয়ে বয়ে চলেছে। এই পদ্মা খাতই এখন বেশী জল বহন করে। ভাগীরথী খাতটি শুষ্ক হয়ে পড়েছিল, কিন্তু সত্তর-এর দশকে ফারাক্কা প্রকল্পে ফিডার ক্যানেল কেটে গঙ্গার জলরাশির এক অংশ পুরনো ভাগীরথী খাতে দেওয়া হয়েছে। যার ফলে এই মরা খাত আবার পুর্নজন্ম পেয়েছে এবং কলকাতা বন্দরের নাব্যতা কিছুটা বাড়িয়েছে। ১৯৯৬ সালের ফারাক্কা চুক্তি অনুযায়ী জল বন্টনের সূত্র হিসেবে একটি নির্দিষ্ট হিসেব রয়েছে। তবে এটা জেনে রাখা প্রয়োজন যে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, শুখা মরশুমে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রতিদিন ৪০,০০০ কিউসেক জল ভাগীরথী খাতে না এলে কলকাতা থেকে সাগরের নাব্যতা বাড়বে না। এটা কলকাতা বন্দরের পক্ষে একটা সমস্যা।

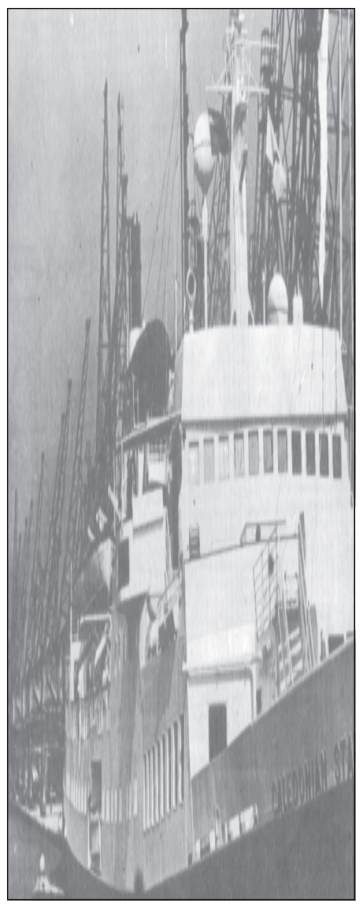

আজকের বিশেষ অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে দেশের প্রত্যেকটি বন্দর এক সংকটের মুখোমুখি। এতদিন বন্দরগুলির আর্থিক প্রয়োজনে সরকার পাশে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সরকারও চাইছে বন্দর কর্তৃপক্ষ নিজেরাই তাদের আর্থিক দায়ভার বহন করুক। ফলে নানা ভাবনা চিন্তাও আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু কিছু সমস্যা রয়েছে যার সমাধান একদিনে সম্ভব নয়। যেমন কলকাতা বন্দর। এই বন্দরের অস্তিত্ব এতদিনে বিপন্ন হতো। যদি না কেন্দ্রীয় সরকার বার্ষিক পলি খননের ব্যয়ভার ভর্তুকি হিসেবে না দিতেন। ভর্তুকি না পেলে কলকাতা বন্দর বিপন্ন হয়ে পড়বে। অথচ ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসের অছিপরিষদের সভায় একটা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল যাতে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটে কলকাতা বন্দরের।

খিদিরপুর ডকে অপে(া করছে এক

র পথে ?

হলদিয়া বন্দর।

এটা অত্যন্ত আনন্দের কথা। কুলপি বন্দর নিঃসন্দেহে রাজ্যে অর্থনীতির নতুন দরজা খুলে দেবে। তাই সমুদ্রের দিকে আরো এগিয়ে গিয়ে সাগরদ্বীপের কাছে প্রথমে কেবল জেটি স্থাপন ও পরে সাগরদ্বীপে সম্পূর্ণ একটি বন্দরই গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছেন বন্দর কর্তৃপক্ষ। আজকের এই বাজার অর্থনীতির যুগে দেশের বন্দর পরিচালন ব্যবস্থাও এক সঙ্কটের মুখে। কলকাতা বন্দরের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। তাই হলদিয়া ডক যদি স্বতন্ত্র বন্দরে পরিণত হয়, তবে ভবিষ্যতে কলকাতা বাঁচবে, সাগরদ্বীপে গড়ে ওঠা বন্দরের কাঁধে ভর দিয়ে।

কলকাতা বন্দরের আর্থিক অবস্থা খারাপ হলেও হলদিয়া এখনও তা পুসিয়ে দিচ্ছে। হলদিয়া ও কলকাতার মিলিত ব্যালান্স সিটে লাভই রয়েছে। কিন্তু এরকম আর কত দিন? ক্রমে ক্রমে নাব্যতার কারণে কলকাতার মতোই হলদিয়া ড্রাই হয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় জাহাজদপ্তরই স্বীকার করছে, এখন হলদিয়া বন্দরে ২৪ টনের বেশি ওজনের জাহাজ ঢুকতে পারে না। ফলে জাহাজ হলদিয়ায় ঢুকতে না পারার জন্য ব্যবসা মার খাচ্ছে। কারণ সমুদ্রে বড় জাহাজ দাঁড় করিয়ে ছোট আকারের বোটে মাল বহন করে নিয়ে আসার খরচ বেড়ে যাচ্ছে চড়া হারে। বর্তমান যুগে বন্দর ব্যবহারকারীদের প্রয়োজন এখন উন্নত পরিকাঠামোর, যাতে অতিদ্রুত সময়ে মাল খালাস ও তোলার কাজ শেষ করা যায়। কারণ মাল খালাস ও তোলার কাজে বিলম্ব হলে সময়ের দাম অর্থে গুণতে হয় জাহাজ কোম্পানিগুলিকে। এর ফলে হলদিয়ার কাজকর্ম কমে যাচ্ছে। আয় কমে যাচ্ছে। যে হাল দাঁড়িয়েছে তাতে বর্ষায় ৪০ হাজার টনের বেশি জাহাজ ঢুকতে পারে না।

বস্তুত আজ ড্রেজিংয়ের অভাবে হুগলী নদীর নাব্যতা যেভাবে হ্রাস পাচ্ছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে হলদিয়া বন্দর সামগ্রিক ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। আর হলদিয়া বন্দরকে কেন্দ্র করে কেবলমাত্র হলদিয়ায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ রয়েছে। উত্তর ও উত্তর পূর্ব ভারতের অর্থনীতির এক বড় অংশ নির্ভরশীল হলদিয়া বন্দরের উপর। বন্দর বন্ধ হয়ে গেলে পশ্চিমবঙ্গ সহ উত্তরপূর্ব ভারতের অর্থনীতি ধাক্কা খাবে। কয়েকলক্ষ মানুষ বেকার হয়ে পড়বে। এর প্রভাব পড়বে রাজ্যের অর্থনীতিতে। গোড়ায় ঠিক ছিল, কলকাতা বন্দরকে বাঁচাতে নদীমুখের পলি কেটে তা ফেলা হবে হলদিয়া বন্দর থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরে সাগরের কাছাকাছি। যাতে ওই বালিমাটি স্রোতের সঙ্গে জলে ধুয়ে চলে যায়। কিন্তু কার্যত হল ঠিক উল্টো টাই। কলকাতা বন্দরের মুখ থেকে কাটা বালি ফেলা হয়েছে মোহনায়। ফলে বালি ও পলি জমে হলদিয়া বন্দরের প্রশস্ত মুখ ক্রমশই ছোট হয়ে আসছে।

কেন্দ্রীয় জাহাজ দপ্তর স্বীকার করছে হলদিয়া ২৩/২৪ টনের বেশি ওজনের জাহাজ আর ঢুকতে পারে না অথচ এখন বিশ্বের দরিয়ায় এক লাখ টনের জাহাজের চলাচলই বেশি। ফলে বড় জাহাজ হলদিয়ায় ঢুকতে না পারার জন্যে ব্যবসা মার খাচ্ছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং শিল্পমন্ত্রী রাজ্যের উন্নয়ণ নিয়ে বড়বড় গালভরা বুলি আওড়ালেও হলদিয়া বন্দরের এই সংকটজনক পরিস্থিতিতেও সিটু মাঝেমাঝেই আন্দোলনের হুমকি দিচ্ছে। এতে সংকট আরও ঘনীভূত হয়েছে।

হলদিয়া বন্দর চালু হওয়ার পর জেলিংহাম ও অকল্যান্ডে কোনও সময়ই গভীরতা ৫.৪ মিটারের নিচে নামেনি। কিন্তু নদীর নাব্যতা ও ড্রেজিং সমস্যার জন্য হলদিয়া বন্দরের আজ এই করুণ অবস্থা। অথচ ড্রেজিং-এর জন্য প্রতিবছর ৩০০ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দেয় কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টকে। ঠিক সময় ড্রেজিং না করার ফলে অকল্যাণ্ডে গভীরতা ৪.১ মিটার বলা হলেও এর গভীরতা আরও কম। তাই হলদিয়ার সমস্যা খতিয়ে দেখা দরকার এবং প্রয়োজন সবল পরিচালনার। দেশের অনান্য বন্দরের সঙ্গে তাল মিলিয়েই হলদিয়াকে চলতে হবে। হলদিয়া মরে গেলে ভয়াবহ বিপদ পশ্চিমবঙ্গের, এটা যেন মনে রাখা হয়।

সেখানে ঠিক হয়েছিল হলদিয়ায় আর নতুন করে কন্টেনার বোঝাই পণ্য নেওয়া হবে না। কন্টেনার পণ্য আসবে কলকাতায়। হলদিয়ায় জোর দেওয়া হবে আকরিক লোহা, কয়লা, সালফার, চুনাপাথর ইত্যাদি পণ্যে। বড় ও ভারী জাহাজ আসুক হলদিয়া বন্দরে আর ছোট জাহাজ আসবে কলকাতায়। এর সঙ্গে কলকাতায় জোর দেওয়া হবে অন্তর্দেশীয় নৌ পরিবহনে। ছোট জাহাজ আর বড় বজরায় পণ্য চলাচল করুক কলকাতা ছুঁয়ে।

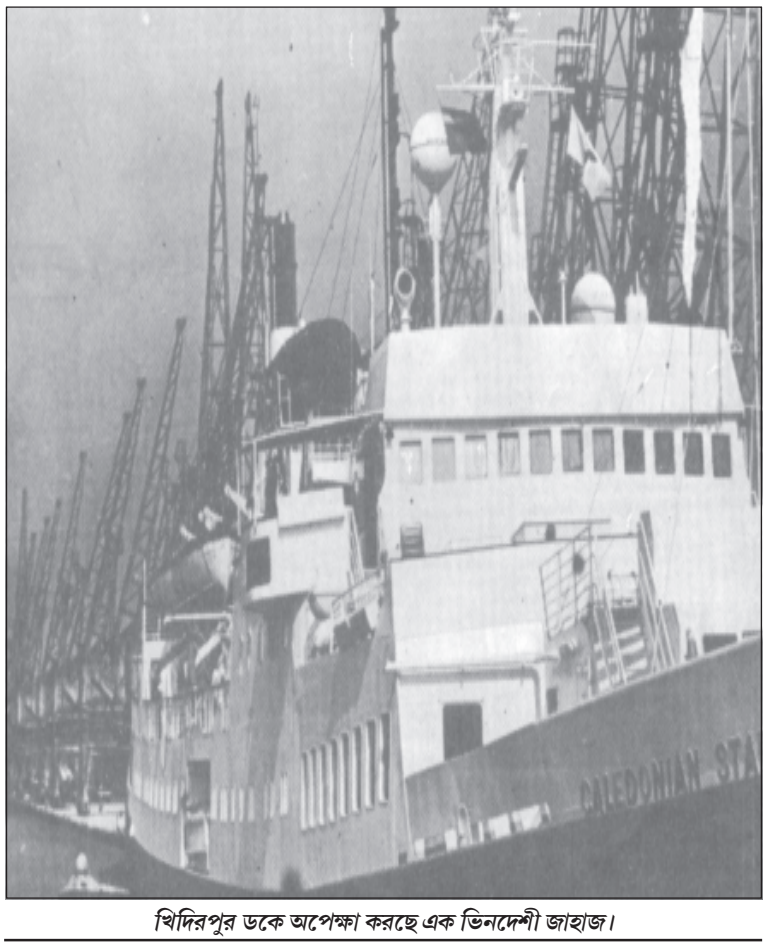

খিদিরপুর ডকে অপেক্ষা করছে এক ভিনদেশী জাহাজ।

কিন্তু এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি।

ভারতের প্রায় প্রত্যেকটা বন্দরেই রয়েছে আধুনিক পরিকাঠামোর অভাব। কলকাতা বন্দরও তার ব্যতিক্রম নয়। বন্দর ব্যবহারকারীরা চায় এমন পরিকাঠামো যাতে খুব কম সময়ে মাল খালাস ও তোলার কাজ শেষ করা যায়। কারণ মাল খালাস বা তোলার ক্ষেত্রে দেরি হলে সময়ের দাম অর্থে গুণতে হয় জাহাজ কোম্পানিগুলিকে। আর এসবের জন্য যন্ত্র নির্ভরতা বাড়ানোর ভাবনা যে হয়নি তা নয়, কিন্তু সেখানে প্রধান অন্তরায় শ্রমিক সংগঠনগুলি। যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ালে অনেক শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়বে। এখন কলকাতা হলদিয়া মিলিয়ে দুই বন্দরের মিলিত কর্মীসংখ্যা প্রায় ১৩ হাজারের মতো। তাছাড়া কোনও বন্দর দিয়ে পণ্য আনা বা পাঠানো লাভজনক তা বিচার বিশ্লেষণ করে বন্দর ব্যবহার করে জাহাজ কোম্পানিগুলি। এসবের সঙ্গে যুক্ত হয় জাহাজ রাখার মাসুল কতটা, সেখানকার শ্রমিকদের উৎপাদন শীলতা ও পরিস্থিতি কেমন — এসব দিক বিচার বিবেচনা করা হয়। কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ বর্তমান পরিস্থিতি বিচার বিশ্লেষণ করে উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি দিতে চাইছে। কিন্তু সব সমস্যার সমাধান করতে পারছে কি?

স্বস্তিকার দাম

প্রতিসংখ্যা – ৪.০০ টাকা

বার্ষিকগ্রাহকমূল্য

সডাক্- ২০০.০০ টাকা

PIONEER®

নিখুঁত লেখার খাতা

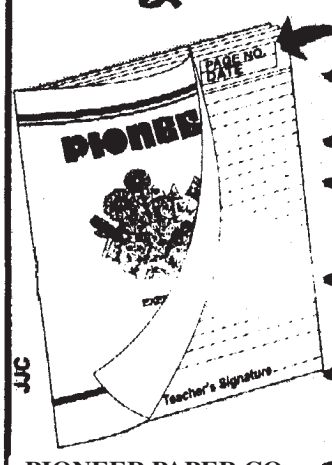

প্রতি পৃষ্ঠায় PAGE NO. DATE এর ঘর।

পাইওনিয়ার পূর্ব ভারতের সর্বাধিক বিক্রিত খাতা।

আদর্শ বাঁধাই ও সুন্দর সাইজ।

ভাল হাতের লেখার জন্য মসৃণ Creamwove & D.T.P.P. কাগজ ব্যবহার করা হয়।

প্রতিটি খাতায় সঠিক মার্জিন এবং লাইনিং। সর্বোত্তম গুণমান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী।

ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশিত IS: 5195-1969 নির্দেশিকা কঠোর ভাবে পালন করার প্রয়াস।

প্রতি পৃষ্ঠায় Teacher's Signature..... কলাম।

PIONEER PAPER CO.
74, Beliaghata Main Road,
Kolkata - 10, Phone : 2373-0556, 2370-4152
Fax : 2373-2596,
E-mail : pioneer3@vsnl.net

PIONEER®

সঠিক গুণমানই আমাদের পরিচয়

সন্ত্রাস ও সরকার

মুসলিম সন্ত্রাসবাদীরা এবার সন্ত্রাসের ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিকে। আর তাই তারা সুপরিকল্পিতভাবে পর পর দু'দিন বিস্ফোরণ ঘটাল কর্ণাটক ও গুজরাটে। দক্ষিণ ভারতের রাজ্য কর্ণাটকে এবারই প্রথম ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। আর গুজরাটে বিজেপি দীর্ঘ দিন ধরে ক্ষমতায় আছে — যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ বিশ্বে এক আলোচিত নাম। অবশ্য ইতিপূর্বে যে এ দুটি রাজ্য সন্ত্রাসের কবল থেকে মুক্ত ছিল এমন নয়। কয়েক বছর আগে কর্ণাটকের রাজধানী ব্যাঙ্গালোরের এক বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানে যে জঙ্গি আগ্রাসন ঘটানো হয়েছিল তাতে মারা যান এক বিজ্ঞানী অধ্যাপক। হয়েছিল ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি। এর কিছু আগে গুজরাটের রাজধানী গান্ধীনগরে অক্ষরধাম মন্দিরেও ঘটেছিল সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ। সেখানেও জঙ্গিদের গুলিতে মারা যান বহু পুণ্যার্থী। তখন সে রাজ্যে ছিল বিজেপি-র শাসন এবং মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন মোদি।

অনেকদিন বাদে এবার হঠাৎই ২৫ ও ২৬ জুলাই পরপর দু'দিনের বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে ব্যাঙ্গালোর ও আমেদাবাদ। দুটি ক্ষেত্রেই ছিল সিরিয়াল ব্লাস্ট।

এদিকে দু'দিনে দু'রাজ্যের ধারাবাহিক বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেছে ইণ্ডিয়ান মুজাহিদিন নামে একটি ইসলামিক সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এর পিছনে রয়েছে হুজি (বাংলাদেশ), লস্কর-ই-তৈবা ও সিমি-র ন্যায় বিচ্ছিন্নতাবাদী, ভারতবিরোধী, পাকপন্থী ও আই এস আই মদতপুষ্ট জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি। উদ্দেশ্য, ভারতে সশস্ত্র সন্ত্রাস ছড়িয়ে জনমনে ভীতি ও আতঙ্ক সৃষ্টি করা এবং সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে এদেশকে আর্থিক দিক থেকে দুর্বল করে দেওয়া — যাতে পাকিস্তান সহজেই ভারতকে কাবু করতে সক্ষম হয়।

আবার প্রথম বিস্ফোরণের দিন হিসেবে সন্ত্রাসবাদীরা বেছে নিয়েছে জুম্মাবার (শুক্রবারকে)। এই দিনটি মুসলিমদের কাছে পবিত্র দিন। ইতিপূর্বেও বহু বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে এই দিনে। অর্থাৎ ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক জঙ্গি - সন্ত্রাসবাদীদের কাছে এই দিনে 'কাফের' (বিধর্মী) নিধনও একটি অতি পবিত্র কাজ। এখন প্রশ্ন, দুটি বিজেপি শাসিত রাজ্যে কেন পরপর এই ধারাবাহিক বিস্ফোরণ? তবে কী এই বিস্ফোরণের পিছনে রয়েছে কেন্দ্রের ইন্ধন? তারা এর দ্বারা কী প্রমাণ করতে চাইছে যে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থ? মিঞাভাইদের খুশি করতে ওই দুই রাজ্যে সন্ত্রাসবাদীদের বিস্ফোরণ ঘটানোর সুযোগ দিয়ে তাদের ভোট নিজেদের বাক্সে টানতেই বিস্ফোরণ কান্ড নয় তো? অসম্ভব কিছু নয়। কারণ কেন্দ্র সন্ত্রাসদমনে তত আন্তরিক নয়। বরং সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি যথেষ্ট নমনীয়। সেকুলারবাদীরা মুসলিম ভোটের স্বার্থে সন্ত্রাসবাদকে জিইয়ে রেখেছেন। তাঁদের কাছে দেশের চেয়ে ভোট বড়। আর তারাই দেশকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া।

।। ২ ।।

চতুর্দিকে যেভাবে বোম বিস্ফোরণ, বোমা উদ্ধার, নাশকতা মূলক কার্যকলাপ চলছে, সেটা খুবই আতঙ্কের বিষয়। না রাজ্য সরকার, না কেন্দ্র সরকার কারও এ ব্যাপারে কোনো সক্রিয় প্রচেষ্টা নেই বলেই মনে হয়। জঙ্গি রা এতেই সক্রিয় হবার ব্যাপারে উৎসাহ পাচ্ছে।

কয়েকটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে — (১) ব্যাঙ্গালোরে বিস্ফোরণ, (২) আমেদাবাদের হাসপাতালে বিস্ফোরণ, (৩) সুরাটে বোমা উদ্ধার, (৪) ই-মেলে শহর ওড়ানোর হুমকী, (৫) আমেদাবাদে ধৃত সিমির সদস্য, (৬) সুরাটে ১৮টি তাজা বোমা, (৭) মুর্শিদাবাদে ধৃত লস্কর জঙ্গি, (৮) রাজস্থানে ৩টি তাজা বোমা উদ্ধার। এর উপর আছে ভারতের বিভিন্ন এলাকায় বারবার ঢুকে পাকিস্তানী হামলা। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের লোক দেখানো তদন্তের কথা শুনলে জনগণ হাসবে। যেহেতু প্রথমটি সাইকেল বোমা বিস্ফোরণ সেইহেতু সরকার সাইকেলের দোকানে লাগাচ্ছে নজরদারি টিভি। এরপর হয়তো শোনা যাবে মোটর সাইকেল বোমা বিস্ফোরণ হলে মোটর সাইকেলের দোকানে নজরদারি টিভি, গাড়ি বোমার ক্ষেত্রে গ্যারেজ বসাবে টিভি। কী হাস্যকর ব্যবস্থা!

দেশ পাকিস্তানী আই এস আই, সিমি, লস্কর, মুজাহিদিন, আল কায়দা, হরকত উল জেহাদি ইসলামি, জইস ই মহম্মদ সংগঠনে ভরে গেছে। তাদের দেশের বিভিন্ন স্থানে যাবার নিরাপদ রাস্তা ভায়া বাংলাদেশ-পশ্চিমবঙ্গ হয়ে। পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে জঙ্গি দের নিরাপদ স্থান।

কী রাজ্য কী কেন্দ্র সরকার জঙ্গি ধরা পড়লে তাদের প্রাণদণ্ডের পরিবর্তে কয়েদ করে রাখে যাতে প্রমাণাভাবে তাকে ছেড়ে দিতে পারে। তাহলে সংখ্যালঘুদের যদি বা কিছুটা মন ভেজানো যায়, যাতে করে নিজ অনুকূলে নির্বাচনে তার ভোটটা পড়ে। কিন্তু তাও হচ্ছে না দেখে, রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার সংখ্যালঘু অনুদান দিতে প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছে। (১) সংখ্যালঘু ছাত্রবৃত্তি (২) মাদ্রাসা তৈরিতে অনুদান (যদিও বুদ্ধ দেব বাবু মনের গোপনকথা 'মাদ্রাসায় জঙ্গি আস্তানা' বলে ফেলেছিলেন)। (৩) মাদ্রাসা স্কুল বোর্ড, (৪) হজে ভর্তুকি, (৫) সংখ্যালঘুদের জন্য কি করবে ঠিক করতে পারছে না। ছাড় অনুদান দিতে দিতে রাজকোষ শূন্য করতেও দ্বিধা করবে না।

চাকুরিতে বিশেষ ধর্মের জন্য কোনও ছাড়ের কথা আইনে নেই তাই, নাহলে হয়তো বা সংখ্যালঘু প্রেমিক কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সকল চাকুরিক্ষেত্রে মুসলিমদেরকেই একশভাগ সুযোগ দিয়ে দেশটাকে পাকিস্তান বানিয়ে ছাড়ত। তার ছোট একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। সম্প্রতি পঞ্চায়েত হারের ধাক্কায় ও সাচার কমিটির রিপোর্টে দেখা গেছে, পুলিশ বিভাগে মুসলিমরা সংখ্যায় কম। তাই তাদের আরও বেশি করে সুযোগ দিতে রাজ্য সরকার উদ্যোগী। সরকারি চাকুরিতে কোনও বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই, তাই এরা মুসলিম প্রেমে মাতোয়ারা।

সিপিএম পঞ্চায়েত স্তরে ভোটের ফল খারাপ হওয়াতে সরকারি চাকুরিতে আর্থ-সামাজিক উন্নতি ঘটাবার জন্য মুসলিমদের সংখ্যা বাড়ানোর উদ্যোগ শুরু হয়েছে সরকারি স্তরে। তাই যদি হয়, তবে সমাজ বিরোধী জঙ্গি ধড়পাকড়ের ক্ষেত্রে প্রশাসন আরও পিছিয়ে পড়বে, বিপদে পড়বে। কারণ আনতুলে সাহেবের মতে সকল মুসলমান জঙ্গি না হলেও সকল জঙ্গিই যে মুসলমান এটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

রাজ্যসরকার সংখ্যালঘু তোষণে যেমন লজ্জাজনকভাবে নেমে পড়েছে তেমনই রাজ্যের নেতা-নেত্রীরা কম যায় না। সোমেন মিত্র তো এতো ব্যাকুল হয়েছেন যে রুকবানুর রহমানকে ছাড়া তাঁর কোনো সভা সমিতিই চলছে না। মমতা তো রিজওয়ানুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী পালন করতে চলেছেন, যেন রিজওয়ানুর কোনও মহামানব ছিলেন। এরপর কেন্দ্র সরকার সেনাবাহিনীতে মুসলিম সেনা নিয়োগ করলে আরও পাকিস্তানী হামলা বাড়বে। ফল স্বরূপ ভারতবর্ষ আবার মুঘল সাম্রাজ্যে পরিণত হবে।

আমরা ভারতীয়রা বারুদের স্তূপের ওপর বাস করছি।

দেবপ্রসাদ সরকার, মেমারী, বর্ধমান।

পুর ও নগর শব্দের উৎস

পুর শব্দটি প্রাচীনতম সাহিত্য বেদে পাওয়া যায়। পুর লোকালয়গুলি চারিদিকে প্রাচীর দিয়ে বেষ্টিত থাকত। পুরে প্রবেশ করার জন্য থাকত এক বা একাধিক পুরদ্বার। পুরগুলি পূর্ণ থাকত বাসগৃহ, মন্দির, জলাশয়, স্নানাগার, বিশ্রামাগার, উদ্যান, প্রশস্ত রাস্তা ইত্যাদি দিয়ে। বলার উদ্দেশ্য হল, পুরগুলি পরিকল্পিতভাবে পূর্ণ ছিল। এই পূর্ণ অর্থাৎ পূ-র-ণ শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে পুর। অভিধান অনুযায়ী 'পূর' কে 'পুর' লেখা যায়। উদাহরণ হিসাবে হস্তিনাপুর, জনকপুর, কাঞ্চি পুরম ইত্যাদির কথা বলা যায়। সাধারণত ছোট আয়তনের পুরকে পুরী বলা হত। যেমন ছিল বা আছে ইন্দ্রপুরী, শিবপুরী, জগন্নাথপুরী ইত্যাদি। উল্লেখ্য, পুর শব্দের বিপরীত শব্দ হচ্ছে গ্রাম। গ্রাম-লোকালয়ে কোনরূপ ঘেরা বেষ্টনী থাকত না, থাকত মুক্ত অবস্থায়। তাই গ্রামের ক্ষেত্রে পূর্ণ হওয়ার প্রশ্ন ছিল না। আবার পুর শব্দের প্রতিশব্দ হচ্ছে নগর। কতকগুলি গৃহ নিয়ে গড়ে উঠছে গ্রাম। কোনও এক বিশেষ গ্রামের পরিধি অপরিকল্পিতভাবে বাড়তে বাড়তে হয়ে গেল ন-গ্রাম অর্থাৎ গ্রাম নয়। ন-গ্রাম অর্থাৎ ন-গ-রা-ম এর সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে নগর। প্রথমদিকে পুর ও নগর লোকালয়ের মধ্যে পার্থক্য ছিল ঠিকই তবে এক সময় পুর এবং নগর শব্দগুলি তাঁদের বৈশিষ্ট্য কিছুটা হারিয়ে ফেলে। যে কোনও বৃহৎ লোকালয় নামের সঙ্গে পুর বা নগর শব্দ যুক্ত হতে থাকে। যেমন ছিল বা রয়েছে — কুশিনগর, কলিঙ্গনগর, বিজয়নগর ইত্যাদি। আরও পরবর্তীতে পুর ও নগর তার 'বৃহৎ লোকালয়ের' বৈশিষ্ট্যও হারিয়ে ফেলে। যে কোনও ছোট বা বড় লোকালয়ের সঙ্গে পুর বা নগর শব্দ যোগ হতে থাকে। যেমন রয়েছে — দিনাজপুর, ইসলামপুর, বিধাননগর, সশ্রুতনগর ইত্যাদি। উল্লেখ্য, পুরসভাকে হিন্দিতে নগরপালিকা বলা হয়। পরিশেষে আমরা বলতে পারি 'পুর' শব্দের মধ্যে লুকিয়ে আছে 'পূর্ণ' এবং নগর শব্দের মধ্যে লুকিয়ে আছে 'গ্রাম' কথাটি।

রাজকুমার জাজোদিয়া, কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

জনমত

বিস্ফোরণের মানে ঠাণ্ডা মাথায় খুন

উদয় সরকার

ব্যাঙ্গালোরের পরদিনই আমেদাবাদে। হতও বেশি পরদিন, পঞ্চাশের বেশি, আহত প্রায় দু'শ। দুটি বিস্ফোরণেই জড়িত থাকার প্রমাণ মিলছে হুজি, ইণ্ডিয়ান মুজাহিদিন, সিমি, লস্কর-এ-তৈবা, আল হাদিস — পরোক্ষে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আই-এর। এরা সকলেই আল্লাহ্‌র বান্দা এবং এই সব ন্যক্কারজনক ঘটনাগুলি ঘটানোও হয় মহান আল্লাহ্‌ তালার নামে। দেশের তথাকথিত প্রগতিশীল সেকুলার (পিক্যুলার!) দলের নেতাদের মত প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক সংবাদ মাধ্যমেরও সত্যকে বিকৃত করার অপচেষ্টা (স্টার নিউজের মুম্বাই দপ্তরে ইণ্ডিয়ান মুজাহিদিনের পাঠানো ইংরেজি ই-মেল ভুলভাবে হিন্দি অনুবাদ করে প্রচার করা)। বিস্ফোরণের পর দেশের বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (যিনি একসময় লোক সভায় স্পিকার ছিলেন — স্পিকার পদ সংকীর্ণ রাজনীতির উর্দ্ধে!) শিবরাজ পাতিল মহাশয়ের আগের একই বিবৃতির পুনরাবৃত্তি। আর কতদিন এভাবে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের সন্ত্রাসবাদ কার্যকলাপের মূল্য দেশবাসীকে জীবন দিয়ে এবং অঙ্গহানি করে চুকাতে হবে?

দেশের সব মুসলমান সন্ত্রাসবাদী নয়, কিন্তু বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে যারা প্রতিবারই ধরা পড়ছে তাদের প্রায় সকলেই তো মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক এবং তারা একাজ করছে সমগ্র মুসলমানজাতির জন্য এবং অবশ্যই মহান আল্লাহ্‌ তালার নামে। আল্লার নামে, সম্প্রদায়ের নামে, সমগ্র মুসলিমজাতির (!) নামে এইসব অমানবিক জঘন্য হত্যাকাণ্ডের নিন্দা দেশের মানবতাবাদী, শান্তিপ্রিয় মানুষদের মধ্যে থেকে যতটা হওয়া উচিত ঠিক ততটা হয় না। এইসব সন্ত্রাসবাদী হত্যাকান্ডের তদন্তও সঠিকভাবে হয় না। প্রতিবাদ যেটুকু হয় তা দেশের ক্ষমতালোভী, সুযোগসন্ধানী, ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল নীতি পালন কারী তথাকথিত এন্দ্বস্তত্ত্বপ্ত্রব্জ মুখোশধারী রাজনৈতিক নেতা ও দলগুলির পক্ষ থেকে। যারা প্রতিক্ষেত্রেই নিজেদের রাজনৈতিক লাভ-লোকসান হিসেব করে প্রতিবাদের সুর বাঁধে। দেশের প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক মিডিয়াও একই পথের পথিক।

বর্তমান দেশের শাসক ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর যে অবস্থান এবং যেভাবে দেশের মুসলমান সম্প্রদায়কে তোষামোদ করার হিড়িক শুরু হয়েছে তাতে এইসব সন্ত্রাসবাদী সিরিয়াল ব্লাস্ট সহ নানারকম কুকর্মের ঘটনা দিনদিন বাড়বে এবং নিরীহ মানুষের প্রাণহানি বেশি হবে। কথায় বলে — রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট। মুসলমানদের এইসব কাজের যৌক্তিকতা বোঝানোর জন্য অনেক বুদ্ধিজীবী (!) বিরানব্বই-এর বাবরি কাঠামো ধ্বংস, ২০০২-এর গুজরাট দাঙ্গা, মুসলমানদের অনুন্নয়ন ইত্যাদিকে দায়ি করেন।

অতীতে মুসলমান শাসকরা হাজার হাজার মন্দির ধ্বংস করেছে, মন্দিরের বিগ্রহ ভেঙ্গে ফেলেছে, অপবিত্র করেছে একথা অস্বীকার করা মানে ইতিহাসকে বিকৃত বা অস্বীকার করা। আর ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর একটি পরিত্যক্ত কাঠামো ভেঙ্গে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে মাত্র এবং একাজ করতে গিয়ে আন্দোলনকারীদেরই অনেকে নিহত হয়েছেন। নিরীহ মুসলমানদের প্রাণহানি ঘটানো হয়নি। এই বাবরি কাঠামো ভাঙ্গার পর যে দাঙ্গা সারা দেশে এবং আমাদের প্রতিবেশি দেশগুলিতে সংঘটিত হয়েছে তা দাঙ্গাপ্রিয় মুসলমানেরা ঠাণ্ডামাথায় করেছে। অসংখ্য মন্দির ভেঙ্গেছে। যথেচ্ছ হত্যা, ধর্ষণ ও লুটপাট চালিয়েছে। বিরানব্বই-এর বাবরি কাঠামো ভেঙ্গে ফেলা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফল। এবং পৃথিবীর ইতিহাসে একটি সফল আন্দোলন যেখানে প্রাণহানি খুবই নগণ্য। এই বাবরি কাঠামো ধ্বংসের অজুহাত দেখিয়ে সাম্প্রতিক সিরিয়াল বিস্ফোরণগুলিকে যুক্তিগ্রাহ্য করা যায় না। যেমন মুসলমানরা দীর্ঘদিনের সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতকে খণ্ডিত করে পাকিস্তান আদায় করে নিয়েছে এবং এর জন্য দাঙ্গা বাঁধিয়ে অসংখ্য নিরীহ মানুষকে খুন করেছে। তাই বলে পাকিস্তানকে অস্বীকার করা যায় না এবং প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কাপুরুষের মতো বোমা মেরে মুসলমানদেরকে হত্যা করা যায় না।

২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গা ঘটেছিল গোধরা কান্ডের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে — যেখানে তীর্থ করতে যাওয়া ৫৯ জন নিরীহ করসেবককে ট্রেনের কামরায় আগুন লাগিয়ে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। অমানবিক বীভৎস এই ঘটনার প্রতিবাদে দল-মত নির্বিশেষে গুজরাটের কিছু কিছু এলাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সেদিন একজোট হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে মারমুখী হয়ে উঠেছিলেন। আর দাঙ্গা কখনও একতরফা হয় না। গুজরাট দাঙ্গায় মুসলমান বেশি নিহত হয়েছে এটা ঠিকই। কিন্তু মুসলমান ছাড়া আর যারা নিহত হয়েছে তাদের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। সুতরাং সেই দাঙ্গার সূত্র ধরে এখন নিরীহ নারী, শিশুসহ সাধারণ মানুষকে বোমা মেরে হত্যা করা কখনও যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারে না।

তৃতীয়ত, ভারতে মুসলমানদের দ্বারা সংঘটিত এইসব সন্ত্রাসবাদী কাজের জন্য তাদের অনুন্নয়নকে অনেক সময় দায়ি করা হয়। বর্তমানে কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকার নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য যে সাচার (চাচার!) কমিটি গঠন করে তার রিপোর্টে মুসলমানদের অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী এবং তপশিলি জাতি উপজাতিদের থেকেও পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায় হিসেবে দেখিয়েছে। কিন্তু এই রিপোর্ট সঠিক নয়, এক পেশে। এটা সত্যি মুসলমান সম্প্রদায়ের একটা অংশের মধ্যে অনুন্নয়ন প্রকট। এটা তাদের সম্প্রদায়গত, শিক্ষাগত, প্রথাগত, সামাজিক, ত্রুটির কারণে। রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর অনেকে বই লিখে ফেলেছেন, 'আজাদ ভারতে গোলাম মুসলমান'। ভারতে না হয় মুসলমানেরা গোলাম হওয়ার জন্য অনুন্নত। কিন্তু আমাদের প্রতিবেশি মুসলিম দেশগুলিতে তাদের অবস্থা কেমন? স্বাধীন পাকিস্তান ও বাংলাদেশে মুসলমানেরা কি খুবই উন্নত? উত্তর অবশ্যই না। উন্নত হলে ভারতের দিল্লী, হরিয়ানা, মুম্বাই, গুজরাটে বাংলাদেশী মুসলমানেরা কাজের সন্ধানে

(এরপর ১৩ পাতায়)

বিঘ্নবিনাশী গণেশ— শ্রুতি ও পুরাণে

সোমনাথ নন্দী

সনাতন হিন্দু ধর্মে গণেশোপাসনা অন্য চার উপাসনার মতো সুপ্রাচীন। ভগবান গনেশ মঙ্গলের প্রতীক। তিনি সিদ্ধি প্রদাতা, বিঘ্নহারী। সর্ব উৎসবের প্রারম্ভে গণপতির আরাধনা ও পূজা অবশ্যকৃত্য। একমাত্র তাঁর পূজাতেই হয় সর্ব উৎসবের নির্বিঘ্ন সমাপ্তি।

ভগবান গণপতি যে বিপদহারী, আখ্যান সূত্র বিধৃত লিঙ্গপুরাণের পূর্বভাগের ১০৪ ও ১০৫ তম অধ্যায়ে।

একবার ইন্দ্রাদি দেবগণ দানব-রাক্ষসদের ক্রমবর্ধমান শক্তি সঞ্চয় ও পরাক্রমে শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। ভাবলেন দানবকূল যেভাবে ব্রহ্মা ও হরিহরকে তপস্যা ও যজ্ঞের দ্বারা প্রসন্ন করে প্রবল হয়ে উঠছে, ভবিষ্যতে তারা চিরশত্রু দেবতাদের নিশ্চিন্তে থাকতে দেবে না। চিন্তাকুল দেবগণ ভাবতে লাগলেন চিরস্থায়ী উপায়ের কথা। শেষে স্থির করলেন, এ বিষয়ে তাঁরা শূলপানি মহেশ্বরের শরণাপন্ন হবেন।

ভগবান শঙ্করকে স্তবস্তুতিতে প্রসন্ন করে জানালেন দেবতারা তাঁদের অভিপ্রায় — বিঘ্নহন্তা গণপতির সৃষ্টি। যাঁর-দ্বারা দেবতাদের তো বটেই, মনুষ্যলোকেও বিঘ্নহরণ ঘটবে। তিনি হবেন ভক্তদের রক্ষা কর্তা।

দেবতাদের কাতর প্রার্থনায় প্রসন্ন ত্রিপুরারি। তাঁদের ইচ্ছাপূরণের জন্য বললেন — দেবগণ আপনারা নিশ্চিন্ত হন। শীঘ্রই আমার অংশে দেবী উমার গর্ভে জন্ম নেবে সুরেশ্বর গণপতি গণেশ।

কিছুকাল বাদ দেবী পার্বতীর পুত্ররূপে জন্ম নিলেন ত্রিশূল পাশধারী গণেশ। পুত্রের জ্যোতির্ময় কান্তি দর্শনে পুলকিত শিব-শিবানী। ভগবান শঙ্কর আপন আত্মজের জাতকর্ম সংস্কার করে নিজ ক্রোড়ে স্থাপন করে আনন্দে একাধিক্রমে বহু বর প্রদান করলেন। বললেন, হে বৎস মহীতলে যাঁরা দক্ষিণাহীন যজ্ঞ করবে, তাঁদের মধ্যে তুমি বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। যেসব ব্যক্তি অন্যায় পথে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাজনিত কর্মানুষ্ঠানে রত হবে, তাদের সংহারে ব্যপৃত থাকবে তুমি। যাঁরা তোমায় ভক্তি ভরে উপাসনা করবে, তোমাতে সমর্পিত হবে, তাঁদের ইহলোক ও পরলোকে যত্ন সহকারে পালন করবে। ত্রিজগতে সর্বত্র বিঘ্নেশ্বররূপে তোমার পূজা ও বন্দনা হবে। হে বিঘ্নহারী বিনায়ক, যাঁরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও আমাকে পূজা করবে বা এই তিন দেবতার প্রসন্নতা অর্জনের জন্য অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ করবে, বিঘ্ন নিবারণের জন্য সর্বাগ্রে তোমার পূজা করতে হবে। শ্রৌত, স্মার্ত বা লৌকিক যে কোনও পূজায় সিদ্ধি অর্জনে তোমার পূজা হবে সর্বাগ্রে। নচেৎ সব বিফলে যাবে।

লিঙ্গ পুরাণ অনুসারে দেবতাদের বিঘ্ননাশের কারণে গণপতির উদ্ভব। কিন্তু ভবিষ্য পুরাণ বলে অন্য কথা। একবার মর্ত্যলোকে মনুষ্যকুল দৈবকৃপা প্রত্যাশী হলেও, আপন সাফল্যকে নিজ পুরুষাকারের ফল হিসাবে ভাবতে লাগল। হয়ে উঠল ক্রমে উদ্ধত ও অভিমানী। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা প্রমাদ গণলেন। তিনি মানুষের অভিমানকে খর্ব করতে সৃষ্টি করলেন বিঘ্নরাজ গণেশের। বিধান দিলেন গণেশার্চনা ব্যতীত মানুষের সাফল্য তথা সিদ্ধি প্রাপ্তি হবে সুদূর পরাহত।

ভগবান গণেশের গজানন মূর্তি পরিগ্রহকে নিয়ে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ও শিব পুরাণে দুটি ভিন্ন কাহিনী প্রচলিত। প্রথমটি হল, দেবী পার্বতী শরীরের পরিত্যক্ত চন্দন দিয়ে একটি মূর্তি তৈরি করে তাতে প্রাণসঞ্চার করেন। তারপর সেই পুত্রকে ভবনের দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত করেন। ইতিমধ্যে ভবানীপতি শঙ্কর দেবী সকাশে এলে দেবীপুত্র গণেশের সাথে তুমুল সংঘর্ষ বাধে। শিবের ত্রিশূলাঘাতে গণেশের মুন্ড ছিন্ন হয়। পার্বতী পুত্রের অবস্থার কথা শুনে ক্রোধে জ্বলে ওঠেন। শিবানীকে শান্ত করতে শিব আপন অনুচরদের পাঠান

।। গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে প্রকাশিত।।

চারদিকে। যে জীবের মাথা আগে আসবে, সেই মাথাই বসান হবে ছিন্ন মুন্ডে। শিবানুচরগণ প্রথমে একটি হস্তিমুন্ড পান। শিব সেই মুন্ড গণেশের ছিন্ন মস্তকে প্রতিস্থাপন করে, তাঁকে গজানন হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন এবং সর্ববিঘ্ন হন্তার বর দান করেন।

অন্য উপাখ্যান হলো, দেবী পার্বতীর ক্রোড়ে বালক গণেশের প্রতি শনিদেব দৃষ্টি দান মাত্র গণেশের মস্তক চূর্ণ হয়ে যায়। দেবীকে সন্তুষ্ট করতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিকে গিয়ে পুষ্পভদ্র নদীতীরে একটি হস্তিকে দেখতে পান। সেই হস্তির মাথা সুদর্শন চক্রে কেটে গণেশের ছিন্ন মস্তকে প্রতিস্থাপন করেন। এরপর দেবীকে তুষ্ঠ করতে সমস্ত দেবগণ গণেশকে নিজ নিজ বরদানে শক্তিশালী করে তোলেন।ব্রহ্মা নিজ কমন্ডুল দেন তাঁকে। ধরিত্রী মাতা তাঁকে দেন বাহন মূষিক। মা পার্বতী তাঁকে উজ্জীবিত করেন বিশেষ মিষ্টান্ন ও মোদকে।

পুরাণে গনেশের আখ্যান যে ভাবেই বর্ণিত হোক, অধ্যাত্মশাস্ত্রে তাঁর অবস্থিতি ভিন্নরূপে। প্রমাণ আগম শাস্ত্রের একটি শ্লোক — আকাশস্যাধিপো বিষ্ণুরগ্নেশ্চৈব মহেশ্বরী। বায়োঃ সূর্যঃ ক্ষিতেরিশো জীবনস্য গণাধিপঃ।। অর্থ হল, আকাশ তত্ত্বের অধিষ্টাতা বিষ্ণু, অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবী দুর্গা, বায়ুতত্ত্বের অধিষ্ঠাতা সূর্য, ক্ষিতিতত্ত্বের শিব এবং জল বা অপতত্ত্বের অধিষ্টাতা গনেশ। উপাসকগণ আপন আপন শরীরে পঞ্চ তত্ত্বের (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) আধিক্য অনুসারে উপসনায় ব্রতী হন। যাঁদের দেহে জলতত্ত্বের ভাগ বেশি, তাঁদের উপাস্য দেবতা অবশ্যই হবেন গণপতি গনেশ।

শ্রুতি অনুসারে গণেশ শব্দের অর্থ গণের পতি বা স্বামী। মনুষ্য শরীরে যে পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও চার অন্তকরণ আছে, তার পশ্চাতে আছে চতুর্দশ শক্তি। এই চতুর্দশ শক্তির প্রধান শক্তিদাতা হলেন ভগবান গণেশ। তাঁর দিব্যমূর্তি ওঙ্কারের স্বরূপ। সৃষ্টি আদিতে যে শব্দ ব্রহ্মাওঙ্কার রূপে প্রথম ব্যক্ত হন, সেই শব্দব্রহ্মের বিগ্রহ রূপ গণদেব গনেশ। প্রত্যেক মন্ত্রোচ্চারণে যেমন ওঙ্কার সংযোজন আবশ্যিক, তেমনি সর্বপ্রকার মাঙ্গলিক পর্ব বা অনুষ্ঠানে গনেশ পূজা সর্বাগ্রে কর্তব্য। এই শাস্ত্রীয় পরম্পরা সমস্ত হিন্দুজগতে আজও বহমান শত শতাব্দী ধরে। সহস্রাব্দের এর সহস্রাব্দ ধরে। ভক্তগণ তাঁকে প্রণাম নিবেদন করছে একই স্তুতিগনে—

মতো বুদ্ধি র্ভতাননাশো মুমুক্ষ যতোঃ
সম্পদো ভক্ত সন্তোষিকাঃ স্যুঃ।
যতো বিঘ্ননাশো যতঃ কার্যসিদ্ধি,
সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ॥

রোগ আরোগ্যে আধ্যাত্মিকতা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

কথায় বলে — শরীরম ব্যাধি মন্দিরম। শরীর থাকলে ব্যাধি থাকবেই। শরীর এবং মনের সামঞ্জস্যকেই স্বাস্থ্য বলা হয়। হোমিও প্যাথি চিকিৎসার জনক মহাত্মা হ্যানিমান বলেছেন — মন থেকে রোগ হয়। রোগকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। আধি আর ব্যাধি। আধি অর্থাৎ আদি রোগ যা শুরু হয় মনে। মন থেকে আসে শরীরে। হ্যানিম্যান সাহেব যখন বলেছিলেন মন থেকে রোগ হয়, আধুনিক বিজ্ঞান হেসেছিল। ভারতীয় আয়ুর্বেদেও এই তত্ত্ব বলা হয়েছে। আর এখন আধুনিক বিজ্ঞানও তত্ত্বটিকে স্বীকৃতি দিতে শুরু করেছে। পেটে আলসার, তাঁরাই বলছে — 'সাইকোসোমাটিক' কারণ, সাইকো মানে মন। আর সোমাটিক অর্থে শরীর। একটি মানুষের আবেগ ও যুক্তি যখন সমান থাকে তখন সে স্বাভাবিক পর্যায়ে, ব্যতিক্রমে হয় অসুস্থ।

উনিশ শতকের মেডিসিনের খ্যাতনামা অধ্যাপক আরঙ টুসো বলেছিলেন — আমার জীবনে তীব্র হাঁপানি হয়েছিল। যেদিন আমি শুনলাম আমার ঘোড়ার গাড়ির বিশ্বাসী সহিস আমায় ঠকিয়েছে। প্রসঙ্গত মনে পড়ছে আরও একটি ঘটনা। এক ভদ্রলোকের পলেন এলার্জি অর্থাৎ পরাগরেনুজনিত এলার্জি হয়। এক বিয়ে বাড়িতে গিয়ে দেখেন অনেক গোলাপ রাখা হয়েছে। দেখামাত্র তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে যান। পরে জ্ঞান ফিরলে তাঁকে বলা হয় যে গোলাপগুলি প্ল্যাসটিকের। তারপর তিনি সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় সারা বিয়ে বাড়িতে চলাফেরা করেন।

নিউরোলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার

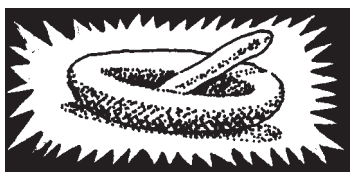

নিরাময়

বার্ষিক সম্মেলনে প্রদত্ত একটি গবেষণা পত্র হতে জানা যায়, দীর্ঘদিনের মাথা ধরাও রোগের কারণ। মাইগ্রেন রোগটির উপসর্গ অর্ধেক মাথা ধরা। টেনসান বা আবেগের চাপ এর প্রধান কারণ। বিশ্বের বহু বিশিষ্ট মানুষ ভুগেছেন মাইগ্রেন রোগে। এদের মধ্যে আছেন সিগমুন্ড ফ্রয়েড, টমাস হেয়ারসন, চার্লস ডারউইন এবং জর্জ বার্নার্ডশ। শোক দুঃখে রোগ দেখা দেয় মানুষের। কথায় বলে অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর। সেই পাথর গলানো যায় যদি তার থেকে গভীরতম দুঃখের কথা শোনান যায় তাকে। বলা বাহুল্য প্রাচীন ভারতে মানুষের মধ্যে রোগ ভোগ কম দেখা যেত। মূলে ছিল উন্নত ভারতীয় দর্শন। যেখানে সুখ-দুঃখকে সমানভাবে গ্রহণ করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। শ্রীমদভগবদগীতার পাতায় পাতায় উক্ত ভাবনার বিচ্ছুরণ স্পষ্ট।

আজকের ভারতে দৈনন্দিন জীবনে মানসিক চাপ ও অস্থিরতাকে সঙ্গী করেই চলতে হয়। জীবন যত জটিল হয়, মনের জটিলতা তত বাড়ে। মানসিক চাপজনিত ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় মানুষ। বাড়ে হৃদরোগ, স্নায়ুবৈকল্য ও উচ্চ রক্তচাপের লক্ষণ। এর থেকে মুক্তির উপায় একমাত্র আধ্যাত্মিক পথ। আধ্যাত্মিকতা শুধু পুজো-আচ্চা নয়, আত্মত্যাগ এর কেন্দ্রবিন্দু। ধরা যাক, প্রিয়জনের মাথা যন্ত্রণা শুরু হলে কোনও প্রিয়জন তাকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করেন। মাথায় হাত বুলিয়ে দেন, তার মাথায় যন্ত্রণা অনেক কমে যায়। ইংরাজীতে একটি কথা আছে A freind a day keeps depression away।

জীবনকে সত্যিকারের সুন্দর, সুখী করতে হলে বিশ্বাস বস্তুটি অপরিহার্য। আত্মবিশ্বাস, ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং পরিবেশ ও পরিজনের ওপর বিশ্বাস। ধর্মীয় উপলব্ধি খারাপ না ভালো, চিন্তা না করে ভগবানের ওপর বিশ্বাস রাখা উচিত। অন্যকে ক্ষমা করা উচিত। প্রশ্ন করা প্রয়োজন নিজেকে — আমার জীবনে মূল্যবান সত্তাকে। অবশ্যই ঈশ্বর। ঈশ্বরে ভালবাসা হবে নিঃশর্ত ও চিরন্তন। প্রতিদিনের জীবনে কারও প্রতি অসন্তোষ, ক্ষোভ, রাগ, তিক্ততা জমিয়ে রাখবেন না। প্রতিদিন পূজার অভ্যাস করা ভাল। পূজার অন্যতম অঙ্গ প্রার্থনা। যা যোগেরই নামান্তর।

প্রসঙ্গত আসি একটি গবেষণার কথায়। আমেরিকাতে এক চিকিৎসক ধর্মস্থানে যাতায়াতকারী ৫০০ জনের ওপর গবেষণা চালিয়ে জানতে পারেন, যাঁরা নিয়মিত ধর্মস্থানে যান ও প্রার্থনার মধ্যে থাকেন, তাঁদের শরীরে এক ধরণের হরমোন নিঃসৃত হয়। যার ফলে তাঁদের হৃদরোগের সম্ভাবনা কমে যায়। আর যাঁরা ধর্মীয় পরিমন্ডলে থাকেন না বা ধর্মীয় আচার-আচারণকে মানেন না তাঁদের উক্ত সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে।

লেখক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক **দীপেন সেনগুপ্তের** তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ **যৌগিক নার্সিংহোম** (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

কর্তব্যবোধ

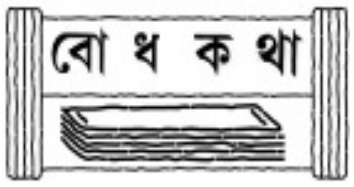

সতীনাথ রায়

নদীতে স্নানের জন্য আজও নিমাই মহারাজ ভোর ভোরই আশ্রম থেকে রওনা হলেন। কাঁধে লাল গামছাটা আর একখানা সাদা থান সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। আশ্রমের মূল দরজার পাশেই ঘুমিয়ে ছিল কুকুরটি। প্রতিদিনের মতো আজও মহারাজের খড়মের আওয়াজে তার ঘুম ভাঙল। সেও মহারাজের পিছন পিছন চলতে শুরু করল। সেই চির পরিচিত পথ। মহারাজ হাতে একটু সময় নিয়েই বের হন। পথে পরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে সুখ-দুঃখের গল্প করতে করতে এমনিতেই নদীতে পৌঁছতে তাঁর অনেকটাই দেরি হয়ে যায়। তার ওপর নদীর ঘাটে এসেও বিভিন্নজনের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চলে, নানা পরামর্শও হয়। এইসবেও কিছুটা সময় যায়। তবে নিত্য দিনের রুটিনে মহারাজের কোনও কষ্ট হয় না। উল্টে একদিন কোনও কারণে নদীতে না যেতে পারলে মনটা যেন কেমন কেমন করে। সেদিনও তিনি যথারীতি নদীতে পৌঁছলেন। মহারাজের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ভক্তরা সাধারণত স্নান সেরে ফিরে যায়। তিনি যখন স্নান করতে নামেন তখন নদীতে দু-চার জন ছাড়া বিশেষ কেউ থাকে না। সাদা থানটা সিমেন্টের এক বেদীতে রেখে মহারাজ জলে নামলেন। কোমর জলে এসে পুবদিকে সূর্যদেবকে বন্দনার পর চতুর্দিকে প্রণাম সেরে তিনি ডুব দিলেন। তারপর আরও একটা ডুব দিতে যাবেন, হঠাৎ এমন সময় কী যেন একটা তার গায়ে ঠেকলো। তিনি অতটা লক্ষ্য না করে আপন মনে আরও দুটো ডুব দিলেন। স্নান সেরে আস্তে আস্তে উঠে আসছেন এমন সময় দেখলেন একটা কাঁকড়া বিছে জল থেকে ওঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কিন্তু নদীর জল কাটিয়ে ওঠার মতো শক্তি তার ছিল না। মহারাজ কাছে গিয়ে হাতে বিছেটা তোলা মাত্রই বিছেটা মহারাজকে দংশন করল। দংশনের যন্ত্রণায় মহারাজের হাত থেকে কাঁকড়া বিছেটা আবার জলে পড়ে গেল।

মহারাজ আবার তাকে জল থেকে তুললেন। কিন্তু এবারও সেই একই ঘটনা ঘটল। নদীর ঘাট থেকে অন্যেরা এই সবই লক্ষ্য করছিল। মহারাজ, তাকে যতবার বাঁচানোর চেষ্টা করে, ততবারই কাঁকড়া বিছেটা তাকে দংশন করতে লাগল। এই ঘটনা বাকীদের খুব অবাক করল। কুকুরটিকেও যেন বিচলিত দেখাল। কিন্তু নিমাই মহারাজের মুখে কোনও বিকৃতি নেই। তিনি তাঁর স্বভাবমতো কাঁকড়া বিছেটাকে বারবার বাঁচানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কাঁকড়াটার বারবার দংশনে তাঁর ডান হাতটা থেকে রক্ত বের হতে লাগলো। তবুও মহারাজ তাঁর বাম হাতটা দিয়ে কাঁকড়া বিছেটিকে কোনও মতে জল থেকে তুলে সেটিকেডাঙায় নিয়ে এলেন। মাটিতে পা রাখা মাত্রই বিছেটা দৌড় দিল। ভক্তরা এই ঘটনায় বেশ অবাক হল। সবাই মিলে মহারাজকে বললেন, মহারাজ, কাঁকড়া বিছেটা আপনাকে অতবার দংশনের পরও আপনি ওকে বাঁচালেন!

আপনাকে যখন ও দংশন করতে লাগল তারপরেও ওকে বাঁচালেন কেন? মহারাজ বুঝলেন, ভক্তরা তার এই ঘটনায় খুব ব্যথা পেয়েছে। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, দেখো, আমি জানি তোমাদেরও এতে কষ্ট হয়েছে। কিন্তু একবার ভেবে দেখ, কাঁকড়াবিছেটা বিপদের মুখে পড়েও ও কিন্তু দংশন করতে ভোলেনি। দংশন করাটাই ওর স্বভাব। একটা ছোট্ট প্রাণী হয়ে বিছেটা যদি ওর স্বভাব না ভোলে তা হলে আমি কী করে আমার স্বভাব ভুলে যাবো?

কাঁকড়াবিছেটা বাঁচানো কী আমার কর্তব্য ছিল না? তোমরাই বলো? মহারাজের কথায় অন্যদের চোখ খুলল। তারাও বুঝলো কোনও অবস্থাতেই কর্তব্যকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। জীবনের শেষ শক্তিটুকুও এই জন্য বিলিয়ে দেওয়া উচিত।

চিত্রকথা ।। ভক্ত ও ভগবান ।। পনের

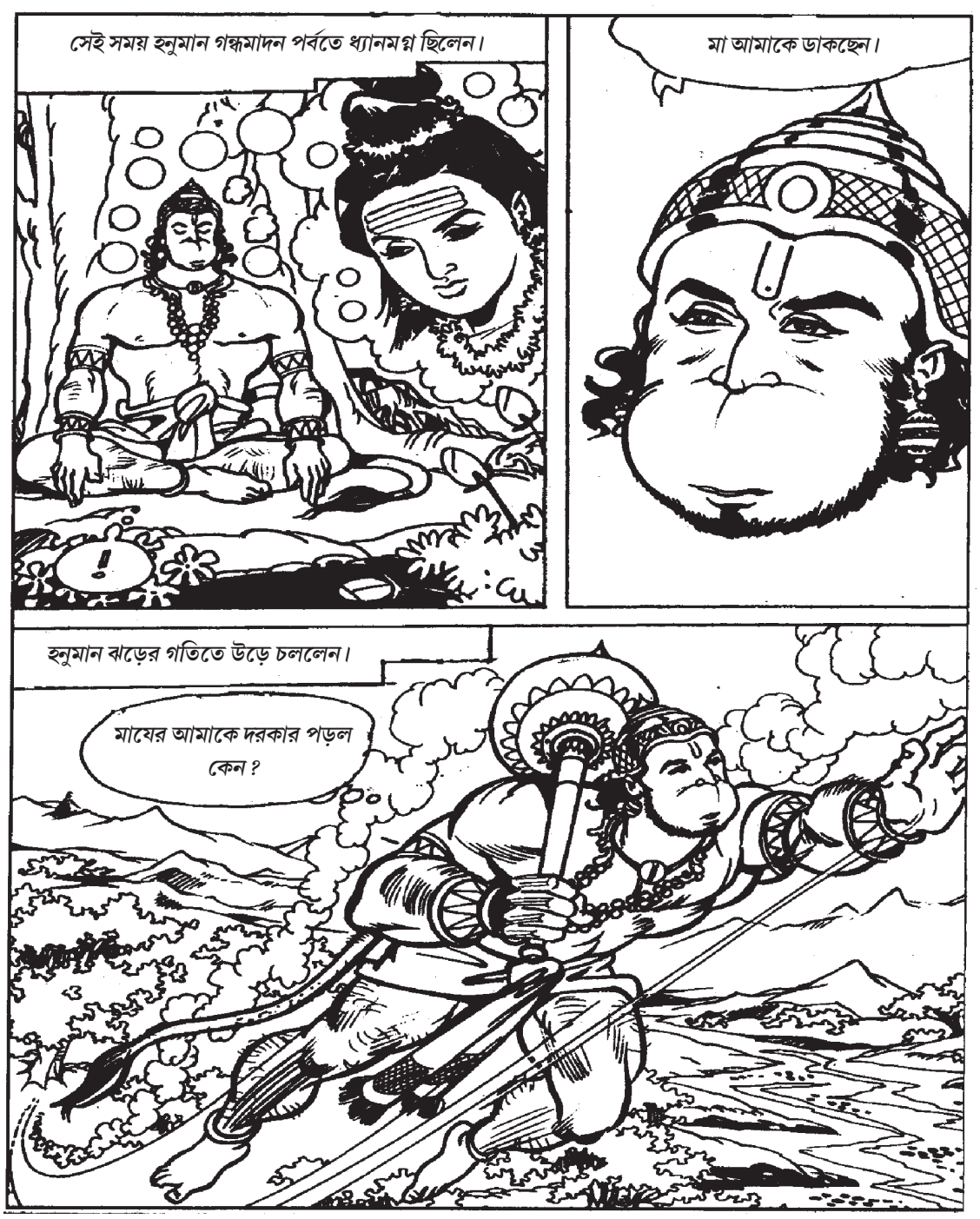

বিচিত্র খবর বিচিত্র গল্প

নির্মল কর

সামান্য ড্রয়িং মাস্টারের ছেলে, অনেকদিন একবেলাও খাবার জোটেনি। অথচ দারুণ ছবি আঁকার হাত। শুতে হত বন্ধুর সঙ্গে বিছানা ভাগাভাগি করে। কবি-বন্ধু ম্যাক্স কাজে বেরলে তিনি ঘুমোতেন। রাতে তিনি ছবি আঁকতেন আর বন্ধু ঘুমোতেন। কুড়ি বছরের এই আঁকিয়ে হঠাৎই একদিন নিজের ছবির নিচে নাম সই করলেন 'পিকাসো'। পিকাসো আসলে তাঁর মায়ের পদবি। বাবার নাম যোসে রুইজ ব্লাসকো। পিকাসোর মৃত্যুকালে (৮ এপ্রিল, ১৯৭৩) তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৭৫০ কোটি টাকা। ওই সময় পিকাসো প্রায়ই বলতেন, 'এখন ইচ্ছে করলে এক লক্ষ ফ্রাঁঙ্কের নোট পাকিয়ে আমি সিগারেট ফুঁকতে পারি।'

☆ ☆ ☆

গল্প হলেও সত্যি। গল্পের মুখ্য-চরিত্রে সুপারম্যান নয়, বছর দশকের একটি মেয়ে। খেলতে খেলতে হঠাৎই এক মাল্টি স্টোরিড বিল্ডিং-এর ১২ তল থেকে নিচে পড়ে যায়। মৃত্যু যেখানে নিশ্চিত, সেখানে অদ্ভুতভাবে বেঁচে গেছে মেয়েটি। কারণ, সে পড়েছিল একটি হুড-খোলা চলন্ত গাড়ির নরম গদিতে। রিং নামের এই চীনা মেয়েটি শুধু একটা মামুলি চোট নিয়ে দিব্যি বেঁচে আছে। খবর বেজিং-এর।

থ থ থ

দুর্গা ও গণেশের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এক ঘোড়সওয়ার। মন্দিরের বিভিন্ন দেব-দেবীর সঙ্গে নিয়মিত পুজো পাচ্ছে। আর তাতেই ক্ষুব্ধ এক ধর্মীয় সংগঠনের দাবি, ওই মূর্তি সরাতে হবে। শুরু সেই ১৮৫৭ সালে। কর্নেল স্টুয়ার্ট তখন কানপুরে। স্থানীয়দের দাবি, শিবমন্দির গড়ে দিতে হবে। স্টুয়ার্ট রাজি হন এক শর্তে, দুর্গা-গণেশের মাঝে তাঁর ঘোড়ায় চড়া মূর্তি থাকবে। অধিবাসীরা শর্ত মেনে নিয়েছিলেন। সেই থেকেই চলছে কানপুরের স্টুয়ার্ট পুজো।

☆ ☆ ☆

প্ল্যানেরিয়া নামে একরকম জলজ প্রাণী আছে, বাংলায় যার নাম পুরুভুজ। এদের দেহকে কেটে খন্ড খন্ড করলে প্রতিটি খন্ডই একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হয়। তবে এই প্রক্রিয়ার সময় সর্বদা মাথার দিকে মাথা আর লেজের দিকে লেজ গজায়।

☆ ☆ ☆

ব্রাজিলের অরণ্যে তাঁদের এনগেজমেন্ট। বিয়ে হল দু'টি উড়ন্ত এরোপ্লেনের ডানার ওপর, আকাশে, ৬ আগস্ট পাত্রী ইংল্যান্ডের ল্যাঙ্কাশায়ার নিবাসী কেটি হজসন আর পাত্র ড্যারেন ম্যাকওয়াল্টার্স। বর ও কনেকে এক একটি বিমানের ডানার সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছিল। বিয়ের পুরোহিত রেভারেন্ড তিন নম্বর বিমান এসে তাদের বিয়ে দেন। তিনটি বিমানে পাশাপাশি উড়তে উড়তে শুভকাজ সম্পন্ন হয়। বিয়ের শপথবাক্য উচ্চারিত হয় আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে। অতিথি আপ্যায়ন হয় নিচে, মাটিতে।

☆ ☆ ☆

সাইবেরিয়ার কিকিনিয়া শহরে সম্প্রতি জাতীয় হামাগুড়ি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। তাতে অলিভেরা নেভজেলা নামে দশ মাসের এক বিস্ময় শিশু ৮.৬ সেকেন্ডে ১৩ ফুট হামাগুড়ি দিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে। অন্যান্য প্রতিযোগীরা অনেক পিছিয়ে পড়ে। কারণ, বেশির ভাগ শিশু ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে হামাগুড়ি দিতে ভুলে যায়।

থ থ থ

ফরাসি সম্রাট ত্রয়োদশ লুইকে কোনও এক বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে স্নান করতে বাধ্য করা হয়েছিল বলে ক্রুদ্ধ সম্রাটের চোখে স্নান হয়ে উঠল দু'চোখের বিষ। ফলে স্নানের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন। পুকুর নদী সমুদ্র তো ছাড়। নিজের বাড়িতে কেউ স্নান করতে সাহস পেতেন না। স্পেনের রাণী ইসাবেলা জীবনে মাত্র দু'বার স্নান করেছিলেন। সেন্ট্ গ্রেগরি তো ঘোষণাই করেছিলেন, শুধু ছুটির দিন রবিবার একবার মাত্র স্নান করা যেতে পারে। উনিশ শতকে আমেরিকার কয়েকটি জায়গায় স্নান নিষিদ্ধ ছিল। ১৮৪২ সালে একবার ঘোষণা করা হয় যে কেউ স্বেচ্ছায় স্নান করতে চাইলে তাঁকে অবশ্যই পুর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে।

এজেন্টদের জন্য

অন্তত পাঁচ কপির কম স্বস্তিকার এজেন্সী দেওয়া হয় না। প্রতি কপি স্বস্তিকার জন্য ১৫.০০ টাকা করে অগ্রিম জমা অবশ্যই রাখতে হবে।

প্রতি মাসের বিলের পাওনা টাকা অবশ্যই পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা প্রয়োজন। অন্যথায় এজেন্সী বাতিল হতে পারে।

স্বস্তিকা ডাক, রেল ও সড়ক পরিবহন দ্বারা পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। ২৫ কপির কম পত্রিকা রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পাঠানো হবে না। রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পত্রিকা নিতে ইচ্ছুক এজেন্টকে নিকটবর্তী রেল স্টেশনের নাম বা পরিবহন সংস্থার নাম, ঠিকানা (পিন সহ) এবং ফোন নম্বর (যদি থাকে) জানাতে হবে।

নতুন এজেন্ট হলে অগ্রিম জমা টাকা সমেত সম্পূর্ণ নাম ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার।

আরও বিস্তারিত জানতে স্বস্তিকা দপ্তরে পত্রালাপ করুন।

— ব্যবস্থাপক

সর্বপল্লী ডঃ রাধাকৃষ্ণণ

মণীন্দ্রনাথ সাহা

প্রতিবছর ৫ সেপ্টে স্বর দিনটি পালিত হয় শিক্ষক দিবস হিসাবে। যাঁর জন্মদিনকে ঘিরে আবর্তিত হয় এই দিবস উদযাপন, তিনি দর্শন শাস্ত্রের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব, একাধারে আদর্শ শিক্ষক, অন্যদিকে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ। শিক্ষকতায় উৎকর্ষতার জন্য তাঁরই নামে প্রতিবছর সারা দেশের অগণিত শিক্ষক রাষ্ট্রপতির হাতে মানপত্র সহ সম্মানিত হন। বর্তমান এবং আগামী প্রজন্মের কাছে সর্বপল্লী ডঃ রাধাকৃষ্ণণ, ঋষির মতন প্রাজ্ঞ এক পরিপূর্ণ মানুষ — A man-total man, a true gentleman, রাধাকৃষ্ণণ চিরকালের প্রেরণা। সদালাপী, কৌতুক স্নিগ্ধ, সীমাহীন পান্ডিত্যের জীবন্ত প্রতিমা, আপন মহিমায় প্রোজ্জ্বল সবর্বপল্লী ডঃ রাধাকৃষ্ণণ। বিশ্ব বন্দিত শিক্ষক ডঃ রাধাকৃষ্ণণকে কোনও বিশেষ মাপকাঠিতে ধরে রাখা যাবে না। তিনি 'ইন্টিগ্রেটেড ম্যান'।

দর্শন চিন্তা ও ধর্মানুষ্ঠান যে মনুষ্য সমাজের প্রয়োজন আছে তা দার্শনিক ডঃ রাধাকৃষ্ণণের লেখাতেই পরিস্ফুট। রাধাকৃষ্ণণের "অ্যান আইডিয়ালিস্ট ভিউ অফ লাইফ" নামক বিখ্যাত গ্রন্থখানির সমালোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক মুরহেড ডঃ রাধাকৃষ্ণণের আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "শুধু ইউরোপ মহাদেশে নয়, সমভাবে এশিয়া মহাদেশেরও মহান ঐতিহ্যের আধ্যাত্মিকভাব সম্বন্ধে রাধাকৃষ্ণণ এমন গভীর জ্ঞানের অধিকারী যা সচরাচর দেখা যায় না। সেই কারণে রাধাকৃষ্ণণ সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে তাঁকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দোভাষী বলাই উচিত।"

ডঃ রাধাকৃষ্ণণ ছিলেন অত্যন্ত ছাত্র বৎসল। তাঁর একটি কথায়, অথবা একটি টেলিফোন বার্তায়, অথবা একটি চিঠিতে যদি কোনও ছাত্রের উপকার হবে বুঝতেন, তাহলে তিনি সেই ব্যাপারে উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে যেতেন। আর দরিদ্র শিক্ষক সম্প্রদায়ের জন্য তাঁর গভীর মর্মবেদনা ছিল। একটি ঘটনায় জানা যায় — "রাষ্ট্রপতি পদে থাকার সময় তিনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ভাষণ দিতে গিয়েছিলেন। কাজ শেষ করে ফেরার সময় তাঁর হঠাৎ মনে পড়ল, তাঁর এক ছাত্রীর স্বামী কাশীতে কোনও একটা গলির ভেতরে এক বাড়িতে রোগশয্যায় শায়িত। রাষ্ট্রপতি তাঁর কনভয়ের পরিচালককে নির্দেশ দিলেন সেই বাড়িতে তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য। রাষ্ট্রপতির সফর সূচীর মধ্যে এই ব্যাপারটি অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এবং ঐ বাড়ির নম্বর, রাস্তার নাম কিছুই তিনি বলতে পারেননি। তবুও সেখানে তাঁকে যেতেই হবে। কনভয় বাহিনী অনেক কষ্টে সে বাড়িটি খুঁজে বের করলেন এবং রাধাকৃষ্ণণকে গন্তব্যস্থানে পৌছে দিলেন।" তিনি তাঁর ছাত্রী এবং তার স্বামীকে দেখে আশীর্বাদ করে আসেন।

রাধাকৃষ্ণণের অসামান্য কৃতিত্ব তিনি ভারতের সাধনা ও সংস্কৃতির মর্মবাণীকে পাশ্চাত্য দর্শনের ভাষায় পশ্চিমের কাছে বোধগম্য করে তুলেছেন। এক কথায় তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে একটি মিলনের সেতু রচনা করেছেন। বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসের অন্তর্গত ঐক্যের সন্ধান এবং সেই ঐক্য সূত্রটি কীভাবে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে, এই সমস্যার সমাধানে রাধাকৃষ্ণণের দান সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। দার্শনিক রাধাকৃষ্ণণ চেয়েছেন আত্মিক শক্তির সমৃদ্ধি। তাই তিনি তাঁর The future of Civilisation গ্রন্থে লিখেছেন, বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার উন্নয়ণের সঙ্গে আত্মিক শক্তির উন্নতি না ঘটালে সবই বৃথা। দেশবাসী আত্মিক শক্তির উন্নতি ঘটাক সেই স্বপ্ন তিনি দেখতেন।

ভারতের রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে বলা হয় তিনি হলেন ত্তক্কনন্দ্রনস্তুন্দ্ধঙ্ধ ট্রনস্মড়ন্দ্বক্ত অর্থাৎ জাঁক-জমকপূর্ণ সাক্ষীগোপাল। কিন্তু রাধাকৃষ্ণণ ছিলেন তার ব্যতিক্রম।

পুরোপুরি রাজনীতির লোক না হয়েও

ডঃ রাধাকৃষ্ণণ-এর ১২১তম জন্মদিন উপলক্ষে প্রকাশিত

কয়েকটা ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন ১৯৫৬-৬৪ পর্যন্ত পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী প্রতাপ সিং কায়রো উৎকর্ষতার যথেষ্ট পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতি ও স্বজন পোষণের অভিযোগ তদন্তের প্রস্তাব ওঠে। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাধাকৃষ্ণণ তদন্তের ব্যাপারে অনড় থাকেন। অবশেষে দাশ কমিশন নিযুক্ত হয় এবং তদন্তে কায়রো দোষী সাব্যস্ত হলে পদত্যাগও করেন।

একইভাবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসাবে ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধে ভারতের ব্যর্থতার জন্য তদনীন্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ভি কে কৃষ্ণমেননকেও ইস্তফা দিতে বাধ্য করেছিলেন। যদিও মেনন ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর খুবই ঘনিষ্ঠ।

১৯৬৫-তে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে তদানীন্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ওয়াই বি চ্যবন ও প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী গররাজি থাকলেও জেনারেল জয়ন্ত চৌধুরীর পরামর্শ মতো পাকিস্তান আক্রমণের প্রস্তাবে তিনি সায় দিয়েছিলেন। একাধারে একজন এহেন দার্শনিক, কোমল হৃদয় শিক্ষক এবং দৃঢ়চেতা প্রশাসকের আজ আমাদের দেশে বড়ই অভাব।

আজকাল আমরা দূরদর্শনের দৌলতে দেখি লোকসভা, রাজ্যসভার মতো গণতন্ত্রের পীঠস্থানে জনপ্রতিনিধিরা মারামারি, লাঠালাঠি, চেয়ার ছোড়াছুঁড়ি ইত্যাদি কান্ড অবলীলাক্রমে করে থাকেন। কিন্তু রাধাকৃষ্ণণ যখন উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে পদাধিকার বলে সংসদের উচ্চকক্ষে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান ছিলেন তখন কোনওদিন, কোনও সাংসদ এরকম আচরণ তো দূরের কথা রাধাকৃষ্ণণের কোনও প্রস্তাবের প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে পারেননি। এখানেও তিনি শিক্ষক, আর সবাই তাঁর ছাত্র।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় মূল্যবোধের শিক্ষার প্রচলন উঠে গেছে। কিন্তু মূল্যবোধের শিক্ষার যে কত প্রয়োজন সে কথা ভারতীয় শিক্ষাজগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র ডঃ রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন — "We are building a civilization and not a factory or workshop. The quality of civilization depends not on the material equipment or political machinery but on the character of a man..........the major task of education is the improvement of character. Nation are not made chiefly by traders and politicians. They are made by artists and thinkers, saints and philosophers."

শিক্ষা জগতের একনিষ্ঠ সাধক রাধাকৃষ্ণণ, রাষ্ট্রদূত, উপরাষ্ট্রপতি, রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হয়েও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শিক্ষা-সাধনা ও শিক্ষাজগত থেকে সরে যাননি। যেন টেনিসনের ইউলিসিসের প্রতিজ্ঞার পুনরাবৃত্তি তাঁর মাঝে হয়েছিল — "I shall follow knowledge like a sinking star beyond the utmost bound of human thought." যেন তাঁর প্রতিজ্ঞা – "I shall drink life to the less."

৫ সেপ্টেম্বর এই প্রখ্যাত চিরবন্দিত শিক্ষকের পুণ্য জন্মদিন। বিরাট সার্থকতা নিয়ে, বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে এ দিনটি আমাদের কাছে হয়ে থাকবে চির ভাস্বর। সার্থকনামা মহামানবের জন্মদিনের সার্থকতা নিয়ে শিক্ষক দিবস আমাদের কাছে মহাপুণ্য দিন। আমাদের জাগবার দিন, আমাদের আত্মবিশ্লেষণের দিন, আত্মজাগরণের দিন, নতুন শপথ নেবার দিন। এই দিন আমাদের সংশোধনের দিন। আমাদের জাতীয় জীবনে তাই অপরিহার্য ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ। এই মহান মনীষীর স্মৃতির উদ্দেশে বিনম্র প্রণাম।

পরলোকে সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। গত ১৩ আগস্ট সবাইকে ছেড়ে চলে গেলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের চুঁচুড়া মহকুমা সঙ্ঘচালক

তথা প্রবীণ অ্যাডভোকেট সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ যিনি সমরদা হিসাবেই সমধিক পরিচিত। রেখে গেছেন স্ত্রী, দুই পুত্র, এক পুত্রবধু, ভাই, তিন বোন এবং অগণিত গুণমুগ্ধ আত্মীয়-স্বজন এবং স্বয়ংসেবকদের। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল সত্তর বৎসর। সদালাপী, মিষ্টভাষী এবং সত্যিকারের এক সমাজসেবী ছিলেন তিনি। চুঁচুড়া শহরের এক প্রান্ত উত্তরচন্দননগরে তাঁর পৈতৃক বাড়ি — 'সাতভাইয়ের বাড়ি' বলে যা বিখ্যাত। তাঁর পিতা তুলসীচরণ ঘোষ ও মা সুশোভন, ঘোষ। এলাকার বেশ কয়েকটি ক্লাব ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন। সমরদা নির্মাণ করেছেন একটি জগন্নাথ মন্দির, দান করেছেন একটি বিশাল বাড়ি দেশবন্ধু গার্লস স্কুলকে। ছোটবেলা থেকে খেলাধুলার প্রতি ছিল বিশেষ আগ্রহ। নিজেও ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাথেলিটিকস-এ 'ব্লু'। ইনকাম ট্যাক্স প্র্যাকটিস করতেন কিন্তু নীতিগতভাবে কখনও উকিল, ডাক্তার ও শিক্ষকদের কাজের জন্য ফি নিতেন না।

১৯৭৭ সালে জনতা পার্টির আমলে তিনি সঙ্ঘের সংস্পর্শে আসেন। রাজনীতির আলোচনা করতেন, চাইতেন জাতীয়তাবাদী প্রকৃত দেশপ্রেমিকরা দেশের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করুক। কিন্তু শত প্রলোভনেও রাজনীতিতে যোগ দেননি। তিনি সঙ্ঘের কাজকেই জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। সঙ্ঘচালক হওয়ার একবছরের কিছু বেশি আগে তাঁর বাড়িতেই তাঁর দেওয়া সঙ্ঘ কার্যালয়ে তাঁর সঙ্ঘ প্রতিজ্ঞা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক অধ্যাপক অমল কুমার বসু। বর্তমান সরসঙ্ঘচালক শ্রী সুদর্শনজী থেকে সঙ্ঘের অনেক অখিল ভারতীয় কার্যকর্তা তাঁর বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। ১৯৮৩ সালে এরকমই ভ্রমণে এসেছিলেন (স্বর্গগত) ভাওসাহেব ভুস্কুটে। তাঁর উপস্থিতিতে চুঁচুড়া দুর্গাগতি মেমোরিয়াল হলে হুগলী জেলার স্বয়ংসেবক সম্মেলনে তৎকালীন জেলা সঙ্ঘচালক অধ্যাপক সুনীলেন্দু ভট্টাচার্য তাঁকে হুগলী-চুঁচুড়া নগর সঙ্ঘচালক নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর মতো ব্যক্তিত্বের সংযোগে সঙ্ঘ স্থানীয় এলাকায় আলাদা পরিচিতি লাভ করেছিল।

প্রতি বৎসর চুঁচুড়া কোর্টের উকিলদের রাখী বাঁধতে যেতেনই স্বয়ংসেবকদের নিয়ে। সঙ্ঘকে তাঁর নিজের অন্তরে গ্রহণ করেছিলেন। প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততার মাঝেও সঙ্ঘের কার্যক্রমে যোগ দিয়েছেন। প্রচারক কার্যকর্তাদের প্রতিও ছিল আন্তরিক টান এবং শ্রদ্ধা।

তাঁর মরদেহ নার্সিং হোম থেকে সোজা কলকাতায় সঙ্ঘের ক্ষেত্রীয় কার্যালয় কেশব ভবনে আনা হলে ফুল-মালা দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান প্রবীণ প্রচারক অমল কুমার বসু, কেশবরাও দীক্ষিত, শ্যামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রান্ত প্রচারক রমাপদ পাল,

(এরপর ১৪ পাতায়)

ঠাণ্ডা মাথায় খুন

(১০ পাতার পর)

আসত না আর পাকিস্তানও তাদের বেকার যুবকদের আল্লার নামে, বেহেস্তের কাল্পনিক আরাম আয়েশের নামে নাশকতামূলক কাজে প্রশিক্ষণ দিয়ে এদেশে পাঠাত না। কাজেই প্রকৃত উন্নয়নের জন্য ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ অংশকে অবশ্যই সঙ্কীর্ণতা পরিহার করে দেশের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে নিজেদের উন্নয়ণ সুনিশ্চিত করতে হবে এবং সমাজের মূলস্রোতে সামিল হয়ে এগিয়ে চলতে হবে। তা না হলে দেশে পরপর ঘটে চলা এইসব সন্ত্রাসবাদী কাজের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতীয়দের মনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা তীব্র থেকে তীব্রতর হবে এবং সহ্যের সীমা লঙ্ঘন করে একসময় যখন তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে তখন সেই আক্রোশ থেকে সংখ্যালঘুদের রক্ষা করা প্রশাসন বা তথাকথিত সংখ্যালঘু তোষণকারী সেকুলার দলগুলির পক্ষেও সম্ভব হবে না।

অতএব সাধু সাবধান!

ALOEVERA A WONDER PLANT

Use EXOTICA brand ALOEVERA JUICE
Consume 30 ml. daily in empty stomach
Controls Acidity, Gas, Indigestion, Constipation etc.

Use ALOEVERA MULTI PURPOSE GEL
Keeps Skin healthy, useful for prevention of dandruff and hairfall

Use ALOEVERA CONDITIONER SHAMPOO
Suitable for normal & dry hair, prevents dandruff and impart & Luster Softness to hair.

Contact : Tele : 9133 2236 1706 / 1707

FREE HOME DELIVERY FOR ORDER ABOVE RS. 450/-
WITH IN KMC LIMIT.

পানিহাটিতে 'অখন্ড ভারত দিবস পালন'

গত ১৫ আগস্ট উত্তর ২৪ পরগণার আগরপাড়া ইলিয়াস রোডে আশা সাগর ভবনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ব্যারাকপুর মহকুমার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল 'অখণ্ড ভারত দিবস' ও গুরুপূজন কার্যক্রম। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক রমাপদ পাল। তিনি হিন্দু সমাজের মধ্যে অখন্ড ভারতের ভাবনা জাগিয়ে তোলার আহ্বান জানান। প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় স্কুলশিক্ষক অরুণ ব্যানার্জী। তিনি বাংলায় সঠিক ইতিহাস চর্চার ওপর আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি পানিহাটি পৌরসভার পৌরপিতা সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মুসলিম তোষণের সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন। সভায় ব্যারাকপুর মহকুমার বিভিন্ন স্থান থেকে ১০৮ জন কার্যকর্তা ও শুভানুধ্যায়ী উপস্থিত থেকে গুরুপূজন করেন।

মহিষাদলে শ্রীগুরুপূর্ণিমা ও রাখীবন্ধন উৎসব

গত ১৮ জুলাই সারা দেশের সাথে পূর্ব-মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলেও শ্রীগুরুপূর্ণিমা উৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষে ওইদিন স্থানীয় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের উদ্যোগে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দের প্রতিকৃতি সহ একটি সুসজ্জিত রথ মহিষাদল বাজার পরিক্রমা করে। এই রথযাত্রায় অসংখ্য ভক্তের সমাগম হয়

সমাবেশ সমাচার

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মহিষাদল খন্ডের উদ্যোগেও এদিন শ্রীগুরুপূর্ণিমা উৎসব এবং রাখীবন্ধন উৎসব পালন করা হয়। খন্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েক হাজার মানুষের হাতে রাখী বাঁধা হয়। স্থানীয় সরস্বতী শিশু মন্দিরের শিশুরাও জনগণের হাতে বিপুল উৎসাহে রাখী বাঁধে।

মেদিনীপুরে 'চাক্কা জ্যাম'

গত ১৩ আগস্ট মেদিনীপুর শহরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের কর্মীদের উদ্যোগে সারা দেশের সঙ্গে দু'ঘন্টার 'চাক্কা জ্যাম' কর্মসূচি পালিত হয়। শহরের জগন্নাথ মন্দির চকে ও কালেক্টরেট মোড়ে পথ অবরোধ করে অমরনাথ মন্দির কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে জমি হস্তান্তর করার দাবি ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে অনুপ্রবেশ বন্ধের দাবি জানানো হয়। অবরোধের নেতৃত্বে ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জেলা সভাপতি মনোরঞ্জন কবি, উত্তম চক্রবর্তী, প্রদ্যোত সাউ, পার্থসারথি বেরা, শুভজিৎ রায় প্রমুখ। জনসাধারণের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে দু'ঘন্টার আগেই অবশ্য অবরোধ কর্মসূচী প্রত্যাহার করা হয়।

শব্দরূপ - ৪৭৯

শ্রেষ্ঠা ঘোষাল

১	■	■	২		৩		■
				■		■	■
৪	৫			■	৬	৭	
■		■	■	■	■		■
■		■	■	■	■		■
৮		৯	■	১০			১১
■	■		■		■	■	
■	১২				■	■	

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ২. প্রতিশব্দে অঙ্গীকৃত, প্রতিজ্ঞাত, প্রথম দুয়ে সত্যতা, ৪. ভণ্ডুল, পণ্ড, বিপর্যস্ত, শেষ দুয়ে তন্ডুল, ৬. বিশেষণে গৌরবর্ণ, শেষ দুয়ে পৃথিবী, ৮. ডাকাতদের দ্রুতচলার কৃত্রিম বাঁশের লম্বা দণ্ডবিশেষ, ১০. অতি সামান্য অংশ, তিনে জননী, ১২. টেবিল টেনিস খেলার অন্য নাম।

উপর-নীচ ঃ ১. অন্য নামে দেবরাজ ইন্দ্র, ২. "—দেশের রাণী সে যে - আমার জন্মভূমি", ৩. জমাট বাঁধা জল, ৫. রাজনীতি সমাজনীতি ধর্মনীতি এই তিনটি শাস্ত্রের ধারণা, ৭. জাঁক, আড়ম্বর, মধ্যে নশ্বর, ৯. এক জাতের শাক, প্রথম ঘরে ঠ্যাং, ১০. অব্যয়ে হঠাৎ সবেগে লাফিয়ে ওঠার ভাব, ১১. ভীত হওয়া, ভয়, এসে, শেষ দুয়ে বৎসর।

সমাধান শব্দরূপ ৪৭৭

সঠিক উত্তরদাতা

রবীন্দ্র নাথ পাল
পি পি রোড, খড়্গপুর,
পঃ মেদিনীপুর

অ	■	■	নি	বে	দি	তা	■
ভ	■	■	র্জী	■	ব	■	■
দ্র	বী	ভা	ব	■	স	ম	য়
■	ভ	■	■	■	■	ম	■
■	ৎ	■	■	■	■	তা	■
আ	স	ন	■	প	রি	জ	ন
■	■	কু	■	য়া	■	■	স্র
■	জ	ল	চ	র	■	■	তা

● এই সংখ্যার সমাধান আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৮ সংখ্যায়।

খাচ্ছে কিন্তু গিলছে না

(৪ পাতারপর)

ব্যাপারটা কখন হবে? তিন চার জন শিক্ষকের স্কুলে কোনও রকম ছেলেদের ঠাণ্ডা করে রাখা যায়। কিন্তু একজন বা দু'জন শিক্ষকের স্কুল তো কম নাই, তার পড়াশোনার চেহারাটা কেমন হচ্ছে, তা বিচার করার কোনও পথ খোলা নাই। পরীক্ষা উঠে গেছে, এসেছে মূল্যায়ণ। পাশ-ফেল উঠে গেছে। প্রাথমিক স্কুল থেকে মাধ্যমিক স্কুলে যেতে এখন শুধু বছর গুণে কাটাতে হয়।

একজন শিক্ষিত অভিভাবকের কাছে জানা গেল তিনি স্কুলের খাতায় নাম তুলে দিয়ে এসেছেন, ছেলেকে স্কুলে পাঠান না। স্কুলে যা খাওয়া-দাওয়া তাতে তাঁর ছেলের শরীর টিকবে না।

অন্য আর একজন অভিভাবক নূতন কথা বললেন। তিনিও একজন শিক্ষক। তিনি বললেন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা আগে চাই। যে সব ছেলেমেয়েরা স্কুলে আসে দেখেন না কি রকম অপরিষ্কার থাকে। কোনও রকমে ওদের মধ্যে বসিয়ে পড়াশোনাটা করানো যায়। এক সঙ্গে বসে খাওয়ানো যায় না। অস্পৃশ্যতা আমি মানি না। তবে অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্নতাকে স্পর্শ করতে মন চায় না। তাই মাষ্টারমশাইকে বলে দিয়েছি — ডাক্তারের বারণ অন্য কোথাও খাওয়া যাবে না।

আর একজন অভিভাবক — ভুল হল, উনি তাঁর ছেলেকে স্কুলে পাঠান না। তিনি নিজে একজন মোটামুটি স্বচ্ছল কৃষক। তাঁর যুক্তি স্কুলে গিয়ে কি হবে? বড় হয়ে মজুর খাটলে দিনের শেষে এখন আশি টাকা আসে, তখন এক শত হবেই। এম এ পাশ করে মাসে এক হাজার-দু'হাজার বেতনে কি লাভ? প্রশ্ন করা হল — একটু বই পড়া নামটা লিখতে জানা তো দরকার। উত্তরে বলেন তা বুঝি, কিন্তু বাবু পড়াশোনার একটা রোগ আছে জানেন — যারা লেখাপড়া শিখেছে তারা আর খাটতে চায় না, লজ্জা করে। চেয়ার টেবিল দাও মাসের শেষে শ' পাঁচেক টাকা দাও। ওতেই যেন রাজত্ব মিলে গেল। এমনও দেখা গেছে যারা বাড়িতে খাবার পায় না তারাও অনেকে স্কুলে আসে না, আমাদের সকলেরই জানা আছে যত কঠোর আইন হোক শিশু শ্রমিক আছে। থাকবেও, না থাকলে অনেক সংসার অনেক দোকান অচল। ভাল মন্দ খাওয়ার আশায় যারা আসত তারাও একঘেঁয়েমির জন্য বন্ধ করে দিচ্ছে। যারা পড়াশোনা করতে আসে তাদের পড়াশোনা হচ্ছে না, তা বলে প্রচার মাধ্যম বসে নাই। প্রতিনিয়ত শুনতে হচ্ছে শিক্ষা চাই স্বাস্থ্য চাইই, এই করেছি সেই করেছি। শুনতে শুনতে কানের দফা রফা।

পরীক্ষা, পাসফেল না থাকা, পড়া শোনার পরিবর্তে পড় পড়া খেলা, যখন থেকে চালু হয়েছে তখন থেকেই ছাত্র কমতে শুরু করেছিল। মিড ডে মিলের টোপে প্রথম দিকে ছাত্র সংখ্যা খুব বেড়ে গেল। শাসক দল সংখ্যার খেলা দেখাতে লাগলেন। কিন্তু তা শেষ হতে না হতে যা বাস্তবে ছিল সেখান থেকেও নেমে যেতে শুরু করল। প্রধান শিক্ষক সহ যারা এ মিলের ব্যবস্থাপনায় আছেন তাঁরা আর গাঁটের কড়ি খরচ করতে পারছেন না। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার হাওয়া ভরা বেলুন চুপসে যাচ্ছে। দোকানে বাকি পড়ছে। খাওয়ারের মান কমছে। শিশু ছাত্রদের খাবার একঘেঁয়ে লাগছে। বিশদভাবে সমীক্ষা করলে আরও অনেক বিচিত্র খবর উঠে আসবে, সে সব বিবরণে আপাতত প্রয়োজন নাই। কেবল দু'একটি প্রসঙ্গ তুলে ধরা উচিৎ বলে মনে হয়। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা যে থালায় খায়, খাওয়ার আগে অনেক জায়গায় তা ধোয়া হয় না। বাড়ি থেকে আনার সময় কত জায়গায় যে তারা থালাটি রাখে, কখনও কখনও ময়লা বইখাতাও থালার উপর রেখে আসে। খাওয়ার আগে তাদের হাত মুখ ধোওয়া হয় না। খাওয়ার পরে হাত মুখ ধোওয়ার ব্যবস্থা এক এক জায়গায় এক এক রকম। অনেক স্কুলে টিউবওয়েল নাই। তাদের কাছাকাছি পুকুরই ভরসা। শিক্ষক শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে বাচ্চারা হাত মুখ ধোয়। নিজেদের থালাও ধুতে হয়। কেমন হয় তাদের ধোয়া? এ প্রশ্ন অবান্তর। কেবল দেখা যাচ্ছে এসব কারণেও অনেক বাড়ির ছেলেমেয়েরা স্কুল বন্ধ করছে। বাধ্য হয়ে নির্লজ্জ ভাবে জল মিশিয়েও বলতে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষরতার হার ৬৮.৬৪ শতাংশ মাত্র। এই জল মেশানো সাক্ষরতা কয়েক বছর পরে আরও বাড়বে কিন্তু তাতে লাভ কতটা হবে তা ভবিষ্যৎই বলতে পারে। এখন 'মিড ডে মিল' খাওয়ার পরিসংখ্যানটিকেই শিক্ষার পরিসংখ্যান বলে দেখান হচ্ছে। স্বাভাবিক ভাবেই সুকুমার রায়ের ছড়া অনুসরণ করে বলতে পারি 'খাচ্ছে কিন্তু গিলছে না'। পড়াশোনার উদ্দেশ্যে খাওয়া চালু করে খাওয়াটাই চালু আছে, উদ্দেশ্যে চুলোয় গেছে।

মুদ্রাস্ফীতি মানুষের তৈরি

(৩ পাতার পর)

গ্রাহকদের অনেক বেশি মূল্যে জিনিস কিনতে হচ্ছে। এই দুয়ের ব্যবধানের যে অর্থ তা খেয়ে নিচ্ছে শপিং মলের মালিকরা। আর এখানেই চাই সরকারের নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু দুর্ভাগ্য হল যে, ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করছে না। দ্রব্যমূল্য নিয়ে এদের তেমন মাথাব্যথা নেই। এর অন্যতম কারণ হল নির্বাচনে সব দল এইসব মুনাফাখোর কর্পোরেট হাউসগুলি থেকে অর্থ পায়। সুতরাং কোনও রাজনৈতিকদল এদের বিরুদ্ধে সরব হতে পারে না সঙ্গত কারণেই। এর নজির মিলেছে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারকে টিকিয়ে রাখতে যে টাকার লেনদেন হয়েছে তা যুগিয়েছে এই কর্পোরেট সংস্থাগুলি। দেখা গেছে প্রধানমন্ত্রী নাকি এমন এক কর্পোরেট হাউসের পারিবারিক দ্বন্দ্ব মেটাতে এগিয়ে এসেছেন।

সুতরাং উন্নয়নের নামে চারিদিকে শপিং মলের যে রমরমা কারবার তাতে দ্রব্যমূল্য কমবার কোনও আশু সম্ভাবনা নেই। বাজার অর্থনীতির প্রবক্তারা বলে থাকেন যে, সরকার ব্যবসা করবে না। সরকার ব্যবসা করলে বিশেষ করে খাদ্য সামগ্রীর ব্যবসা, সেখানে দুর্নীতি সীমাহীন। সরকারি পাবলিক অ্যাকাউন্টস্ কমিটি দেখিয়েছে যে, সরকার দ্বারা সংগৃহীত সরকারি পুলে খাদ্যশস্যের মধ্যে ৩৯ শতাংশ চাল ও ৫৩ শতাংশ গম চুরি হয়ে তা খোলা বাজারে বিক্রি হচ্ছে। এক্ষেত্রে দেশের ইউ পি এ সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ। সুতরাং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঠেকাতে সরকারকে অবশ্যই কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে সস্তায় দেশের খোলা বাজার থেকে (শপিং মল নয়) দারিদ্র্য সীমার নীচে থাকা ৪০ শতাংশ মানুষ নিত্যব্যবহার্য জিনিস কিনতে পারে।

পরলোকে সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ

(১৩ পাতারপর)

স্বস্তিকার সম্পাদক বিজয় আঢ্য এবং অন্যান্যরা। তাঁর স্বয়ংসেবক হওয়ার পিছনে আর একজন প্রচারকের নাম উল্লেখ করা দরকার — তিনি স্বর্গগত অনন্তলাল সোনী। অনন্তদা চুঁচুড়া গেলেই একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতেনই। তাঁর প্রয়াণে হুগলী জেলায় হিন্দুত্বের কাজে একটা অপূরণীয় ক্ষতি হল। সঙ্ঘচালক হওয়ার আগে-পরে বেশ কিছুদিন তিনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের হুগলী-চুঁচুড়া সমিতির সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেছেন।

তাঁর আত্মা শান্তি লাভ করুক, এই প্রার্থনা।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর

ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

দার্জিলিং-এ আসুন

হোটেল **মোনালিসা** -তে

সুলভে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা আছে।

১, টং সুং রোড, (ম্যাল-এর কাছেই), দার্জিলিং ঃ ৭৩৪১০১

মানস কুমার চক্রবর্তী

দূরভাষ ঃ ০৩৫৪-২২৫৩৭৩২ / ৯৪৩৩৪৩৫৪৯৮

কলকাতার যোগাযোগ ঃ ০৩৩-২৫৭২-০৬৯৭

সুকান্তর ভাইপোটি যেন খুন না করে বাংলার বামফ্রন্টকে

বিশাখা বিশ্বাস

বুদ্ধিজীবীরা তার সাথে করমর্দন শেষে দেখে ফেললেন তার সাদা পাঞ্জাবীর হাতায় থোক্ থোক্ রক্তে(র দাগ, আর, তার গায়ের শিল্পেক এসেন্সটুকুর সৌরভের মর্মকথা তখুনি তারা ধরে ফেলেছিলেন রাজ্য জুড়ে বিলিতি মদের ঠেক আর সোনাগাছির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে হাড়ভাঙা খাটুনির শেষে সর্বহারা সমাজের জন্যে যারা জীবনের একটুকু নতুন আনন্দের আয়োজন করেছিল, দেশ বিত্রি(র নায়ক নরসীমা রাও আর মনমোহনের সংখ্যালঘু সরকারগুলির পদসেবা করতে করতে তারাই এখন আবার বুঝেছে, মাল্টি -ন্যাশানালের বি(োয়িত ধনতন্ত্র আর পুঁজিপতি বণিকসংঘগুলির দয়া ছাড়া উন্নয়নের পথে নাকি এগোনো যাবে না। সর্বদাই কাঁধ ঝাঁকিয়ে আঙুল উঁচিয়ে রকের মস্তানের ভঙ্গিমায় কথা বলেন যে শিল্পিত রাজা, ইলেকট্রনিক্স্ বিপ্-ব আর টেলিইনফোমেটিক্সের নতুন রসায়নের মধ্যে তিনিই নি(ে প করে চলেছেন বাংলার মধ্যবিত্ত ভাবনাশীল সমাজের অস্তিত্ব, অন্তর্লোক এবং অণ্বেষাকে। মধ্যবিত্ত চিন্তাশীলতার মধ্যে তার রীতি, রক্ত(, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মধ্যে তিনি দ্রুত সঞ্চারিত করে দিতে চাইছেন গোলকায়নের বাজারি বোধ এবং বাচনকে। লাল ঝান্ডার ছায়ায় দাঁড়িয়ে জীবনে এখনো যারা জয়ী হবার বাসনা ছাড়েননি তাদের জীবনকে নিরর্থক করে দিয়ে অপচয়িত করে দিয়ে ওভারব্রীজ আর ওয়ান্ডার ল্যান্ডের নীল সন্ধ্যায় তিনিই ভাড়াটে কলম দিয়ে নব্য ইস্তাহারে লেখাচ্ছেন উন্নততর কমিউনিজিমের সাথে নিজের ঐতিহাসিক নাম। কমরেড লেনিন, অনেক রাত হয়েছে, অন্ধকার আরো বেশী, তুমি একটুকু ঘুমিয়ে নাও, আমরা দেখি আরো একটু রাত্রি জাগতে পারি কিনা।...

বণিকের মানদন্ড এ রাজ্যে শাসকের রাজদন্ড রূপে আবির্ভাবের সময়ে বাংলার রাজশক্তি(ভিসুভিয়াসের গলিত লাভায় প্রতিরোধ গড়েছিল। কিন্তু শাসিত সমাজের অন্তর্লীন সমর্থনের হিমশৈলের শৈত্যপ্রবাহে ভেঙে পড়েছিল সেই প্রতিরোধের সকল প্রয়াস, বণিকেরাই জিতে নিয়েছিল তাদেরই মনোনীত শিখন্ডী শাসনের অধিকার। লালবাংলার সমকালীন যে ঘটনা অভূতপূর্ব, তাহলো — এই যে, নীরবে এবং নির্দ্বন্দ্বে বণিকেরা এ রাজ্যে তৈরি করে ফেলেছে তাদের ত্রীতদাসকে দিয়ে বাংলা বিজয়ের বাতাবরণ। ঘটনাগুলি অভূতপূর্ব বিপদজনক এই জন্যে যে, বণিকপুঁজি এবং শিল্পপুঁজি এখানে একে ধরেছে অন্যের হাত — পদসেবার অঙ্গীকার নিয়ে রাজ্যের শাসকপার্টি ও খোদ সরকারের একাংশ এখানে হাঁটু ভেঙে বসেছে সেই পুঁজিপতি সংঘের চরণতলে। বিপদ এইখানে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে কোনও রাজ্যে বণিকসভাগুলির জোটবদ্ধতার কাছে কোন সরকার এমন নির্লজ্জ ভাবে কোনওদিন আত্মসমর্পণ করেনি। কোনও রাজ্যেই বণিককুল জোট বেঁধে শাসকপ(ে র অনুকূলে রাজনৈতিক প(পাতে কোনওদিন এমন বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারেনি। বিপদের ভয়াবহতা এইখানে যে, এরাজ্যের বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের রক্ত(লালসার ত্রু(ে অভিযানে যখন উচ্চারিত হয় 'কার কত (মতা দেখে নেবো' — তখন তারই পাশাপাশি এক শিল্পপতি রতন-টাটা মহাদম্ভে রাজ্যের মানুষকে উপে(া করে বেপরোয়া ঔদ্ধত্যে ঘোষণা করেন 'কপালে বেয়নেট ঠেকালেও সিঙ্গুর ছেড়ে যাবো না'। কোন্ সেই সরকারি দৌর্বল্য যার ওপর পা রেখে রতন-টাটারা বাংলার মানুষকে এতবড় স্পর্ধার কথা শোনাতে সাহস পায়? হাইড আইনের হিডেন টার্মের প্রকাশ্য আলোচনার জন্যে যদি সাড়ে চার বছরের প্রণয়ী সরকারের ওপর থেকে প্রেমের সমর্থন প্রত্যাহার করা যায় — তাহলে জনমানসে নিয়ত ঘনায়মান কৌতূহলের ও প্র(ের মুখে পঞ্চায়েতী নির্বাচনে পর্যুদস্ত হবার পরেও কোন সেই 'ট্রেড সিত্রে(ট' যার জন্যে বণিকসভাগুলির পুঁজিপতিগুলির হুকুমদারির কাছে রাজ্য সরকার উন্নয়নের নামে এমন করে মাথা নুইয়ে চলেছে?

ত্রিশ বছরের বামশাসনের সাফল্য নাকি এইখানে যে, এই কালপর্বেই মানুষ আচারে-বিচারে, ভাবে-ভাবনায় সচেতন হয়ে উঠেছে। পশ্চিমবাংলার কোন বিরোধী দল শিল্পায়নের কোন বিরোধিতা কোনদিনই যে করেনি পরন্তু শালবনী, বাঁকুড়া, পু(লিয়ার শিল্প প্রকল্পগুলির (ে ত্রে তারা সরকারের সাথে যে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। — বাংলার বামবিপ্-বে জাগরিত 'সচেতন' সেইসব মানুষগুলি বুঝি সেসব বিষয়গুলি খেয়াল করেননি, না? প্রত্যেকটি বিরোধীদল এবং এমনকী সরকারের শরিক পার্টীগুলিও বহুফসলী উর্বর কৃষিজমি থেকে কৃষক উৎখাৎ, জমি অধিগ্রহণের প্রত্রি(য়া, জমিহারা, স্বগৃহহারা স্ববৃত্তিহারা চাষীর গ্রাসাচ্ছাদনের কেবলমাত্র নিশ্চয়তাটাকেই যে তাঁদের দাবি এবং আন্দোলনের কেন্দ্রমূলে রেখেছে — 'বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটির' সচেতন সেইসব মানুষেরা সেই বিষয়টা বোঝেননি, না? সিঙ্গুরের ট্রেড সিত্রে(ট-কে অমর করার মরীয়া প্রচেষ্টায় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সরকার গৃহবধূর সম্ভ্রম, ধর্ষিতা কুমারীর জীবন, চাষীর উর্বর জমি, সুস্নিগ্ধ শ্যামল গ্রামজনপদ মানুষের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে সেন-সেনাপতিদের হাত দিয়ে টাটা-সালিমের পায়ে উপঢৌকন পাঠাবার পরও সরকার, সরকারাশ্রয়ী পার্টি এবং তাদের নব্য-মনিব, ধনিক-বণিক-শিল্পপতি-পুঁজিপতি সংঘ বিরোধী দলগুলি 'শিল্পবিরোধী' বলে প্রচার চালালে বাংলার মানুষ 'সচেতন' চ(ে আজকের আসল সত্য দেখতে পাবেন না — এমন ভুল একমাত্র 'ভুলবাদীরা' ছাড়া কোনও বেভুলো বাউন্ডুলেরাও করে না।....

দোষ নেই। মেবার পতনের জন্যে প্রয়োজন ছিল একটি শক্ত(সিংহের। হিটলারের পতনের জন্যে প্রয়োজন ছিল একজন গোয়েবলসের। রাশিয়ার পতনের জন্যে ইতিহাস পাঠিয়েছিল ব্রেজনেভকে। নেহে(র পতনের জন্যে ইতিহাস পাঠিয়েছিল কৃষ(মেননকে। রাজনৈতিক ভাবে ইন্দিরা গান্ধীকে খতম করার জন্যে ঈ(র সৃষ্টি করেছিলেন সিদ্ধার্থ রায়কে। কমরেড, খেয়াল রেখো, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য নামের সুকান্তের ভাইপো-টি যেন খুন না করে ফেলে বাংলার বামফ্রন্ট-কে। আস্-সালাম।

বণিকদের হুকুমে নতজানু

(৫ পাতারপর)

বুদ্ধ-বিমান-নিরুপম-সূর্য-গৌতম-রেজ্জাক!

বিধানসভার স্ট্যান্ডিং হেলথ কমিটি যার চেয়ারপারসন হলেন সিপিএম বিধায়ক ডাঃ তপতী সাহা। স্ট্যান্ডিং হেল্থ কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে যে কলকাতার সরকারি হাসপাতালগুলির চিকিৎসা ব্যবস্থা, হাসপাতালের প্রশাসন এবং পরিবেশ নিন্দনীয়। উল্লেখ করা দরকার, হাসপাতালগুলির পরিচালনার জন্য গভর্নিং বডির প্রধান হলেন এক এক জন মন্ত্রী। আরো মজার কথা — এস এস কে এম হাসপাতালে সব থেকে বেশি দুর্নীতি এবং অব্যবস্থা এবং দামিদামি যন্ত্রপতি কেবলমাত্র রক্ষণাবেক্ষণের অবহেলায় নষ্ট হচ্ছে। এই এস এস কে এম হাসপাতালের গভর্নিংবডির প্রধান হলেন স্বাস্থ্য মন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্র। স্বাস্থ্য মন্ত্রী এস এস কে এম-এর গভর্নিং বডির সভা বিগত এক বছরে একবারও ডাকেননি! সরকারি ডেন্টাল কলেজ ডাঃ আর আহমেদ থেকে ডাঃ আর আর পালের মতো পন্ডিত চিকিৎসক শিক্ষক কেন পদত্যাগ করে চলে যান — সে সম্বন্ধে সূর্যবাবু কি ওয়াকিবহাল আছেন? সিপিএম-এর প্রাক্তন বিধায়ক ডাঃ গৌরীপদ দত্ত কি এ বিষয়ে আলোকপাত করবেন?

স্কুল শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী পার্থ দে-র কোনও ক্ষমতা নেই। আদতে মন্ত্রীর কাজ করছেন সেই প্রাক্তন মন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস! পার্থ দে শুধু রবার স্ট্যাম্প মাত্র নয় কি? পার্থবাবু ক্ষোভে ফুঁসছেন, কিন্তু কিছু করার নেই। পার্টির সিদ্ধান্ত মাথা পেতে নিতে হবেই। নইলে কোণঠাসা হবেন। পার্থবাবুও কোনও কাজ সাহসের সঙ্গে করতে চান না। যেটা আবার উচ্চশিক্ষামন্ত্রী সুদর্শন রায়চৌধুরী করেন। সুদর্শনবাবুকে পার্টি নেতৃত্বও সমঝে চলেন। কারণ কলেজ-শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যের বিরোধিতা করার সাহস কারোর নেই। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার একটি অভিনব সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কোচবিহারের দিনহাটায় ফরওয়ার্ড ব্লকের বিক্ষোভ মিছিল এবং গুলিচালনা, একাধিক (তিনজনের) ব্যক্তির মৃত্যু নিয়ে ওয়ানম্যান কমিশন বসানো হয়। সেই কমিশনের টার্মস অফ রেফারেন্স-এ বলা হয়েছিল — "ফরওয়ার্ড ব্লকের মিছিল মারমুখী হয়েছিল"। এখন ফরওয়ার্ড ব্লকের চাপে — "ফরওয়ার্ড ব্লকের মিছিল মারমুখী হয়েছিল" কথাগুলি বাদ দিয়ে নতুন করে কমিশনের টার্মস অফ রেফারেন্স করা হবে। সিপিএম ভীত — পায়ের তলার মাটি কাঁপছে। তাই নতজানু।

সিঙ্গুর নিয়ে যুদ্ধ কালীন অবস্থা সৃষ্টি হতে চলেছে। সুপ্রিম কোর্ট-এর রায় বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে টাটা এখান থেকে কারখানা ব্যাঙ্গালোরে নিয়ে যাবেন বলে শোনা যাচ্ছে? কারণ টাটার কর্তারা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থা, বিরোধীদের শক্তি সম্পর্কে রিপোর্ট-কে সঠিক মনে করছেন না। তাঁরা মনে করেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁদের ভুল বুঝিয়ে সমস্যায় ফেলে দিয়েছে। তাই রতন টাটা বলেছেন, "টাকাটা নষ্ট হওয়া কোনও ব্যাপার নয়, আমরা: একঘরে হয়ে থেকে কাজ চালাবো না।"

স্বস্তিকা

পুজো সংখ্যা ঃ ১৪১৫

সৃজনশীল রচনায় পরিপূর্ণ

এক অসামান্য পরম্পরার পুষ্পাঞ্জলি

তনয়া

সৌমিত্র শঙ্কর দাশগুপ্ত

এই আখ্যানের নায়িকা রিয়া। যাকে বিলাসপুর থেকে নিছক চাকরির খোঁজে আসতে হয়েছে কলকাতায়। কিন্তু প্রতিদিন এই মহানগরীর কাছে অপমানিত হচ্ছে সে। তাই আজ রিয়া চলে যাবে, কিন্তু এবার শান্তির সন্ধানে। কিন্তু কি ঘটনা ঘটেছিল রিয়ার জীবনে?

এছাড়াও থাকছে আরও তিনটি উপন্যাস, অনেক ছোট গল্প, রম্যরচনা। এবং নানা ভাবনায় সমৃদ্ধ নানা স্বাদের প্রবন্ধ গুচ্ছ।

লিখেছেন :— শেখর বসু, কণা বসু মিশ্র, রমানাথ রায়, গোপাল কৃষ্ণ রায়, দীপঙ্কর দাশ, সজল দাশগুপ্ত, সুমিত্রা ঘোষ, মানবেন্দ্র পাল, এষা দে, চণ্ডী লাহিড়ী, কে এস সুদর্শন, রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী, তথাগত রায়, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ রায়, প্রসিত রায়চৌধুরী, দীনেশচন্দ্র সিংহ, সুবীর ভৌমিক, প্রীতিমাধব রায়, গুরুপদ শান্ডিল্য, নৃপেন আচার্য, স্বামী যুক্তানন্দ প্রমুখ।

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হচ্ছে

দাম চল্লিশ টাকা

গ্রাহকদের জন্য

স্বস্তিকার সডাক্ বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ২০০.০০ টাকা। বিশেষ সংখ্যাগুলি সমেত।

স্বস্তিকার গ্রাহক হতে ইচ্ছুক ব্যক্তি নিজ নাম ও ঠিকানা (পিন কোড নম্বর সহ) এবং ফোন নম্বর (যদি থাকে) স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। বছরে যেকোনও সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। পত্রালাপের সময় অবশ্যই আমাদের দেওয়া গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করবেন। মনে রাখবেন গ্রাহক নম্বরের পাশেই যে তারিখটি লেখা হয় সেই তারিখেই আপনার গ্রাহক মেয়াদ শেষ হচ্ছে। অতএব উক্ত তারিখের পূর্বেই পরবর্তী বছরের জন্য নির্ধারিত বার্ষিক গ্রাহক মূল্য জমা দিয়ে গ্রাহক মেয়াদ নবীকরণ করতে হবে।

স্বস্তিকা দপ্তর থেকে প্রতি সপ্তাহে সোমবার পত্রিকা ডাকে দেওয়া হয়। সময়মতো পত্রিকা না পেলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ নেবেন। বারবার ডাকের গোলমাল হলে Chief Post Master General, West Bengal Circle, Yogajog Bhawan, P-36, C.R. Avenue, Kolkata - 12 — এই ঠিকানায় লিখুন।

— ব্যবস্থাপক

Swastika
1September - 2008, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

কালিঞ্জর দুর্গ যেন এক মন্দির নগরী

দুর্গাপদ ঘোষ

'দুর্গ'। শব্দটা যত না রহস্যময় তার চাইতে অনেক বেশি বিস্ময়কর। দুর্গের সঙ্গে 'দুর্ভেদ্য' কথাটার যেমন সঙ্গতি রয়েছে তেমনি 'নিরাপত্তারও। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাইরে থেকে বিস্ময় জাগানো উঁচু উঁচু দেওয়াল, তার মাঝে মাঝে শত্রুর ওপর নজরদারির ফাঁক-ফোঁকর। কল্পনার জগতে আজও ভেসে ওঠে — বর্ম পরা বিশালদেহী সৈনিকদের বর্শা-বল্লম-তীর-ধনুক কিম্বা অন্যান্য অস্ত্র সজ্জিত হয়ে এপাশ থেকে ওপাশে যাওয়া-আসা। টহল দেওয়া। ভিতরে একটা বিরাট এলাকা, যেন একটা ছোটখাটো নগরী আর চারপাশে অন্তত ২০-২৫ ফুট গভীর পরিখা, তাতে রয়েছে স্বচ্ছ জল। কোনও কোনও পরিখায় ছাড়া রয়েছে কুমীর। দুর্গে প্রবেশের প্রধান ফটক তো বটেই, বাকীগুলোতেও মোটা কাঠের পাটাতন। রাজা-রাজড়া সৈন্য-সামন্তদের দুর্গে ঢোকা-বেরনোর সময় সেই পাটাতন ধীরে ধীরে নেমে আসে পরিখার ওপরে। তৈরি হয় অস্থায়ী সেতু। তারপর উঠিয়ে নেওয়া হয় সেই পাটাতন। আবার যে কে সেই — গভীর পরিখা ঘেরা রহস্যময় শহর। বাইরে থেকে আন্দাজ করা যায়, দিনে কিম্বা রাত্রে, গা ছমছমে দৈত্যাকার সব পাঁচিলের ভিতরে রয়েছে বস্তুত একটা সেনা ছাউনি।

পাহাড়ী কিম্বা মরুভূমি এলাকার দুর্গগুলোর বাইরেটা অবশ্য ঠিক এরকম নয়। চারদিকে দুর্গম পাহাড়ী পথ বেয়ে অনেক অনেক উঁচুতে গিয়ে তবেই পৌঁছনো যায় দুর্গদ্বারে। শত্রুর সামনে পরিখা না থাকলেও সেখানে পৌঁছনো বড় সহজ কথা নয়। তাছাড়া উপর থেকে সান্ত্রীরা অনেক নীচে পর্যন্ত নজর করতে পারে। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে ডেরা বানিয়ে লুকিয়ে থেকে পাহারা দেয়। পাহাড় বেয়ে ওঠা শত্রুর ওপর ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মরু এলাকার চারিদিকে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ফাঁকা এলাকা। দুর্গগুলোর নীচের অংশ ভরাট করা থাকে বালিতে। সেই বালির ঢিবি বেয়ে উঠতে গেলে পা হড়কে গড়িয়ে পড়তে হয় নীচে। সুতরাং এখানেও বাকী দুই এলাকার দুর্গের মতোই ঢুকতে গেলে পথ বলতে সেই ফটকগুলোই, যেখানে কঠিন চোখে শ্যেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পাহারাদাররা।

এক কথায় দুর্গ মানে যেন কোনও সুরিক্ষত সেনা ঘাঁটি বা কেল্লা। সেখানে রাজা-রানীরা থাকলেও বস্তুত এক একটা লড়াইয়ের ব্যূহক্ষেত্র। কিন্তু এমন দুর্গও আছে যার মধ্যে ঢুকলে আজও মনে হয় বুঝি কোনও মন্দির নগরীতে ঢুকলাম। এমনই একটা দুর্গ হল উত্তরপ্রদেশের বান্দা জেলার কালিঞ্জর। যে দুর্গ দখল করতে গিয়ে তার সপ্তম দ্বারে ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দের ২৩ মে নিহত হয়েছিলেন সম্রাট শের শাহ সুরি। তারপর একসময় অবশ্য বিদেশী মুসলমান আক্রমণকারীরা এটাকে জবরদখল করে নেয়। যথাসম্ভব ধ্বংসকার্যও চালায়। কিন্তু তবুও এই দুর্গ অভ্যন্তরের মহিমা-গরিমার সবটুকু একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। আজও তা বিস্ময় জাগানো একটি মনোরম দর্শনীয় স্থান হিসাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

কালিগঞ্জ দুর্গের এক প্রাসাদের অংশবিশেষ।

কালিঞ্জর দুর্গের গায়ে পরতে পরতে অবহেলার ছোঁওয়া। উত্তরপ্রদেশের আগ্রা দুর্গ কিম্বা দিল্লীর লাল কেল্লার মতো মোঘল বাদশাদের প্রিয় দুর্গগুলো যতটা প্রচার পেয়েছে বা পেয়ে যাচ্ছে খ্যাতিমান চান্দেলা রাজবংশের কেদার বর্মণের তৈরি সপ্তম শতাব্দীর কালিঞ্জর দুর্গ ঠিক ততটাই উপেক্ষিত থেকে গেছে, এই স্বাধীন ভারতেও।

উঁচু পাহাড়ের মাথায় নির্মিত এই দুর্গ বেশিরভাগ সময়ই হিন্দু রাজাদের দখলে ছিল, বিশেষ করে চান্দেলা রাজবংশের। এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল যাতে সাতটি দরজার যে কোনওটা দিয়েই ভিতরে ঢোকা যায়। ঠিক যেন শৃগালের ডেরার মতো। দ্বারগুলোর নাম হল গণেশ দ্বার, চৌবুরজী দরওয়াজা, বুদ্ধভদ্র দরওয়াজা, হনুমান দ্বার, বড় দরওয়াজা, লাল দরওয়াজা এবং আলমগীর দরওয়াজা। শেষোক্ত তিনটি নাম এসেছে মুসলিম শাসনকালে।

দুর্গমধ্যে কেবল রাজপ্রাসাদ এবং প্রাসাদোপম বাড়ি, হাটবাজার-দোকানপাটই নয়, নির্মিত হয়েছিল অসংখ্য সুন্দর সুন্দর মন্দিরও। বেশিরভাগ নির্মাণই হয়েছিল চান্দেলা শাসনকালে। ধর্মপ্রাণ চান্দেলা রাজবংশের শাসকদের শিল্পপ্রীতি কত গভীর ছিল কালিঞ্জর দুর্গাভ্যন্তরে এলেও তা বোঝা যায়। বিশেষ করে দুর্গের পশ্চিম অংশে নির্মিত নীলকণ্ঠ মহাদেব মন্দির তো এককথায় অতুলনীয়। এই মন্দিরের প্রবেশ দ্বারটি যেন একটি গুহা। এর গর্ভগৃহে আজও বিরাজ করছে ৪-৬ ফুট উঁচু পাথরের শিবলিঙ্গ। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে পাহাড়টিতে গুহার মতো সুড়ঙ্গে কেটে প্রবেশ দ্বারের পাশাপাশি সেই অখণ্ড শিলা কেটেই তৈরি করা হয়েছিল এই শিবলিঙ্গটি।

এই গুহাদ্বারের খুব কাছেই রয়েছে ভৈরব এবং পার্বতীর পাথুরে মূর্তি। এই হর-পার্বতী মন্দির ঘিরে রয়েছে আরও অনেক ছোট ছোট মন্দির এবং পাথর কেটে তৈরি করা বিগ্রহ। নীলকণ্ঠ মন্দিরের স্তম্ভগুলোর কারুকাজ এককথায় অসাধারণ। যে কোনও মানুষকে মোহিত করতে পারে। আজও তার সৌন্দর্য আকর্ষণ করে সবাইকে। বস্তুত নীলকণ্ঠ মন্দিরই কালিঞ্জর দুর্গের প্রধান মন্দির। এর কাছেই আছে একটি জলাশয়। দীর্ঘকাল ধরে এটাই ছিল ওই দুর্গে জল সরবরাহের প্রধান উৎস। তবে এত উঁচুতে এই জলাশয়টি আদতে কোনও ক্রেটার লেক বা আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে জল জমা ছোটখাটো হ্রদ কিনা সেটা এখনও নিশ্চিত নয়।

কেবল মন্দিরগুলোই নয়, গোটা দুর্গ প্রাকারই দৃষ্টিনন্দন নক্সাখচিত। চান্দেলা রাজপুত্র আমন সিং-এর প্রাসাদ তো বটেই এমনকী উল্লেখিত জলাশয়ের পাথুরে ঘাটের নক্সাও চোখ ফেরাতে দেয় না। আমনের প্রাসাদটি দেখলে প্রথমে কোনও মন্দির বলে ভুল হতে পারে। কেননা, তার চারিদিকে খচিত রয়েছে বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি, লতাপাতা, ত্রিশূল, মঙ্গলঘট ইত্যাদি। সবই গ্রানাইট পাথরের।

কালিঞ্জর দুর্গাভ্যন্তরে অনেক গৃহ এবং মন্দিরের গায়ে খোদিত রয়েছে ত্রিমূর্তি — ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর। আছে কামদেব এবং মহাবীর জৈন'র মূর্তিও।

আর একটি আকর্ষণীয় মন্দির হল বেঙ্কট বিহারী মন্দির। এর গর্ভগৃহে এখন কোনও বিগ্রহ নেই, মন্দিরের ভগ্নদশা। কিন্তু তবুও বাইরে থেকে দেখলে যে কোনও লোকের চোখ যেন আটকে যায়। এর চূড়াটা ঠিক মন্দিরের মতো ছুঁচলো নয়, অনেকটা যেন গম্বুজাকৃতির। পরম্পরাগত হিন্দু মন্দিরে এটা থাকার কথা নয়। সেজন্য মুসলমান আমলে এর মাথা ভেঙে গম্বুজাকৃতি দিয়ে কোনও মসজিদ বানানোর চেষ্টা হয়েছিল কিনা তা অনুসন্ধান করা দরকার। অনুসন্ধান করা দরকার কেন এখানে কোনও বিগ্রহের অবস্থিতি নেই। কেউ কি তা তুলে নিয়ে গেছে বা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া দরকার।

রাজপ্রাসাদ, মন্দিরাদি ছাড়াও কালিঞ্জর দুর্গে রয়েছে একটি রাণীমহল। পাহাড়ের একেবারে মাথায় রয়েছে সীতা কুণ্ড, পাণ্ডু কুণ্ড এবং পাতাল কুণ্ড। তৃতীয়টি সম্পর্কে জনশ্রুতি, এতে নাকি পাতাল অর্থাৎ মাটির নীচে থেকে জল উঠে এসেছিল।

এত সুন্দর এবং তীর্থক্ষেত্ররূপী দুর্গ হওয়া সত্ত্বেও পাহাড়ের অনেক উঁচুতে অবস্থিত থাকার জন্য সারা বছর তীর্থযাত্রী কিম্বা পর্যটকের যাতায়াত তেমন নেই। কিন্তু তিল ধারণের ঠাঁই থাকে না কার্তিক পূর্ণিমায়। তখন দেবাদিদেব নীলকণ্ঠের দর্শন ও পূজার্চনার জন্যে সমাগত হন প্রায় ১৫ লক্ষ ভক্ত। সংস্কৃতে কালিঞ্জর শব্দের অর্থ কাল অর্থাৎ সময়কে যা ধ্বংস বা অতিক্রম করে। কথিত আছে স্বয়ং শিব এখানে কালকে হত্যা করেছিলেন। হয়েছিলেন কালজয়ী — কালিঞ্জর। সেজন্য কালিঞ্জর দুর্গ হিন্দুদের কাছে কেবলমাত্র একটি 'দুর্ভেদ্য' দুর্গই নয়, একটি পবিত্র শৈবতীর্থও। যুগে যুগে যার নাম হয়েছে কীর্তিনগর (সত্যযুগ), মধ্যগড় (ত্রেতা যুগ) সিংহগড় (দ্বাপর যুগ) এবং কালিঞ্জর (কলি যুগ)।

উত্তরপ্রদেশের বুন্দেলখণ্ড এলাকায় অবস্থিত কালিঞ্জর দুর্গ আজও সরকারি অবহেলার শিকার। এর সংস্কার করে এটাকে তীর্থক্ষেত্রের রূপ দিতে পারলে লক্ষ লক্ষ — ভক্তের সমাবেশ হবে সন্দেহ নেই। তাতে কালিঞ্জর ফিরে পাবে তার পুরনো গৌরব। চিরঞ্জীবী থাকবে কালজয়ী হয়ে।

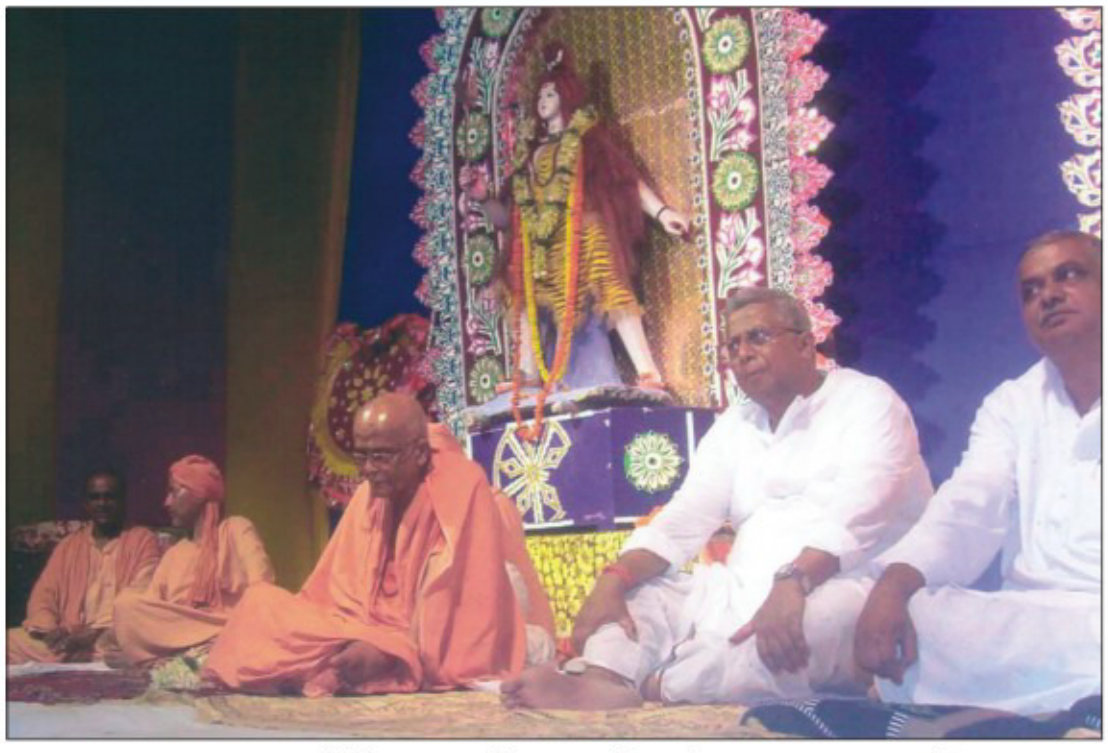

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের জন্মাষ্টমী উৎসবে মঞ্চে সুনীলপদ গোস্বামী (ডান দিক থেকে), তথাগত রায়, স্বামী বুদ্ধানন্দ, স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ, স্বামী যুক্তানন্দ প্রমুখ। ছবি ঃ বাসুদেব পাল

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের জন্মাষ্টমী

(২ পাতার পর)

এদিনের সভার সভাপতি অধ্যাপক ভূপেন্দ্রনাথ শীল তাঁর বক্তব্যে বলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত গীতা, স্বামী বিবেকানন্দ এবং ঋষি কবির 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র একদা অগ্নিযুগের তাবৎ বিপ্লবীদের স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিল। একথা তৎকালীন সময়ের ঘটনাবলীর উল্লেখ করে শঙ্করী প্রসাদ বসু তাঁর বইয়ে বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন। অবতার পুরুষের আবির্ভাব লোকশিক্ষার জন্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়েছিল ধর্ম সংস্থাপনের, ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য।

সভা পরিচালনা করেন সুবক্তা স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ। তিনি বলেন, গীতার শিক্ষা, গীতার বাণী অনুসরণ করলে দেশভাগ হত না।

স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী সভায় উপস্থিত সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেন যে পশ্চিমবঙ্গেও অনেক জেলায় হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে গিয়েছে। গত বছর ২১ নভেম্বর 'তসলিমা বিতাড়ন' অভিযান করে খোদ কলকাতার বুকে ১৬ আগস্টের (১৯৪৬) মহড়া হয়ে গেছে। তাই এখন আমাদের কাণ্ডজ্ঞান ও বাস্তববোধ চাই।

আগের দিনের সভায় বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি বিচারপতি রণেন্দ্র নারায়ণ (অবসর প্রাপ্ত) রায়। আশীর্বচন দেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের যুগ্ম সম্পাদক সম্পাদক স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ মহারাজ।

২৪ তারিখের জনসভায় ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ লিখিত 'বাঙালীর পরিত্রাতা শ্যামাপ্রসাদ' বইয়ের উদ্বোধন করেন হিরণ্ময়ানন্দজী।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com